স্বাধীনতার ইতিহাস

মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা পর্ব-৫

সংকলক

মো. মাসুদুল করিম অরিয়ন

সভাপতি ও উদ্যোক্তা

মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ

সম্পাদক

বীর মুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমান বাচ্চু

(যুদ্ধকালীন কমান্ডার, ৯ নং সেক্টর)

সিনিরয় সহ-সভাপতি, নারায়নগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগ

উপদেষ্টাঃ মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ

তাকিয়া মোহাম্মদ পাবলিকেশন্স

১১,১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রকাশক : মো. আসাদুজ্জামান (মামুন)
বি.এস.এস. (অর্থনীতি); এম.এস.এস. (জাঃবিঃ)
০১৭ ১২৮৯৯৮৮৯, ০১৯১১০৩৩৩৩৬.

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব © : মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আয়েশা নকীব
প্রচ্ছদ : মোঃ আবিদুল্লাহ্
অলংকরণ : আব্দুল্যাহ আল মামুন

ISBN : 978-984-91094-7-1

সৌজন্য

নতুন প্রজন্মের কাছে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা ইতিহাস তুলে ধরে তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ

মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ-এর কর্মকাণ্ডের অংশ

উৎসর্গ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

এবং

৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল শহিদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি

সম্পাদকীয়

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির হাজার বছরের কালজয়ী ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। অসীম সাহসীকতা, বীরত্ব, আত্মত্যাগ আর অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট উৎরে যাওয়ার এক বড় ক্যানভাস। মুক্তিযুদ্ধের অনেক ইতিহাসই রচিত হয়েছে তবে এর সূর্যসৈনিক যারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের ইতিহাস সংরক্ষিত নেই। কিন্তু তারা বাঙালি, জাতির বীর ও সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। আর এই প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধারই আছে আলাদাা আলাদা অসীম সাহসীকতা, বীরত্বগাথা দিনপঞ্জি ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। কালের গহ্বরে অনেকেই আজ বিলীন হয়ে গেছেন, কিছু সংখ্যক এখনও আমরা বেঁচে আছি, আমরাও একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়তে হলে সেই সব অকুতোভয় কালজয়ী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা ইতিহাস সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি এবং আগামী প্রজন্মের কাছে এই মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসীকতা, বীরত্বগাথা আত্মত্যাগের ইতিহাস পৌঁছে দেয়া তোমাদেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমরা দিয়েছি স্বাধীনতা আর সেই চেতনায় তোমরা উদ্বুদ্ধ করবে নতুন প্রজন্মকে যুগে যুগে। তাহলেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শের আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সোনার বাংলা গড়ে উঠবে।

"মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ" স্বউদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যক্তিগত যুদ্ধের বীরত্বগাথা ইতিহাস সংরক্ষণ, প্রত্যক্ষদর্শীর যুদ্ধের বর্ণনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনচিত্র বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে ওয়েবসাইট **www.mssangsad.com** ও বই আকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে কাজ করে যাচ্ছে। ৩,৩৫০ টিরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে "মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা" সহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন সহ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণা নিয়ে রচিত "মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা পর্ব-১,২,৩,৪,৫..." প্রকাশ করে বিভিন্ন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরে তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে আসছে। ভুয়াদের যুদ্ধের কোন বীরত্বগাথা নেই, আর এরা দেশের শত্রু ও দেশের জনগণের সম্পদ বিনষ্টকারী।

পরিশেষে সরকার ও স্বাধীনতার স্বপক্ষের প্রত্যেক ব্যক্তিবর্গের কাছে সার্বিক সহযোগীতা কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে

বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মিজানুর রহমান বাচ্চু (যুদ্ধকালিন গ্রুপ কমান্ডার, ৯ নং সেক্টর)
সিনিয়র সহ-সভাপতি, নারায়নগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগ
উপদেষ্টা-মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ।

সূচি

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১	৭ মার্চের ভাষণ : পটভূমি ও তাৎপর্য	৭
২	বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	১৫
৩	বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম. রুহুল আমিন হাওলাদার কো-চেয়ারম্যান, জাতীয় পার্টি পটুয়াখালী ।	৩৯-৫১
৪	বীর মুক্তিযোদ্ধা আফজাল হোসেন বরিশাল।	৫২-৫৮
৫	বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব ফরিদ উদ্দিন আহমেদ কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	৫৯-৬১
৬	বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মোঃ জহুর-ই-আলম মাগুরা।	৬২-৬৭
৭	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মাইনুল হোসেন মুরাদনগর, কুমিল্লা।	৬৮-৭০
৮	বীর মুক্তিযোদ্ধা সুশীল বিকাশ নাথ ডেপুটি কমান্ডার ১৫৫নং গ্রুপ, ১নং সেক্টর, কক্সবাজার।	৭১-৭৯

৭ মার্চের ভাষণ : পটভূমি ও তাৎপর্য

৫০ বছর আগে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষণটি দিয়েছিলেন। ১০ লক্ষাধিক লোকের সামনে পাকিস্তানি দস্যুদের কামান-বন্দুক-মেশিনগানের হুমকির মুখে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওই দিন বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন- 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' কী পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু সেই ইতিহাস বিখ্যাত ভাষণ দিয়েছিলেন?

১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯ আসনের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পায় ১৬৭টি আসন, বাকি ২টি আসন পায় পিডিপি। ৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনের পর তৎকালীন সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান '৭১-এর ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের পিপিপি নেতা জেড এ ভুট্টো এবং পাকিস্তান সামরিক চক্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে অর্থাৎ আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে ষড়যন্ত্র শুরু করে।

১ মার্চ:

এই দিনে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার কথা ছিল পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের। সারা দেশের মানুষ তাই রেডিয়ো আর টেলিভিশন খুলে বসে থাকলো তার কথা শোনার জন্য। কিন্তু দেশবাসীকে হতাশ করে, ইয়াহিয়ার যায়গায় অন্য আরেকজন এসে ঘোষণা করলো, "পরবর্তী ঘোষণা না আসা পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করেছেন। তিনি পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিকে একটি গভীর রাজনৈতিক সংকট হিসেবে উল্লেখ করেছেন।" তখন তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাঙালি জনগণের মুক্তির ডাক দিলেন। সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেন এটি কোনো গণতন্ত্র নয় বরং এটি পাকিস্তানি শাসকদের স্বৈরাচারী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আমরা বাঙালিরা ঘৃণাভরে এই ঘোষণা

প্রত্যাখ্যান করলাম এবং ২ মার্চ ঢাকা ও ৩ মার্চ সারাদেশব্যাপী বাংলার সাধারণ মানুষ হরতাল পালন করবে। পরবর্তী দিক নির্দেশনার জন্য আপনারা (বাঙালিরা) ৭ মার্চ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এরপর বাঙালি জাতির ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য স্বাধীনতার স্লোগান দিল, "বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো" শুরু হলো অসহযোগ আন্দোলন। গঠিত হলো স্বাধীন বাংলা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ।

২ মার্চ:

ঢাকা এদিন ছিল হরতালের নগরী, মিছিলের নগরী এবং কারফিউর নগরী। দিনের হাইলাইট ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন। সকাল থেকেই মিছিল ছিল বিশ্ববিদ্যালয়মুখী। স্মরণকালে এমন ছাত্র সমাবেশ দেখেনি কেউ, নিউ মার্কেটের মোড় থেকে নীলক্ষেতের সড়ক দিয়ে পাবলিক লাইব্রেরি পর্যন্ত যার বিস্তার। এদিন বটতলায় ওড়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা, ওড়ায় ছাত্রলীগের নেতৃত্বাধীন ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ। সমাবেশ শেষে বিশাল এক মিছিল রড ও লাঠি উচিয়ে ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে এদিন থেকে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান কথাটা একরকম হাওয়া হয়ে যায় বাঙালীদের মুখ থেকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সন্ধ্যায় তার প্রেস কনফারেন্সে বারবার বাংলাদেশ উচ্চারণ করেন। সারা শহরে সরকারের পেটোয়া বাহিনী হরতাল ঠেকাতে মাঠে নামে। পঞ্চাশ জনের মতো গুলিবিদ্ধ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। এদের বেশীরভাগই তেজগাঁও এলাকার। তেজগাঁও পলিটেকনিক স্কুলের ছাত্র আজিজ মোর্শেদ ও মামুনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে আনার পর আজিজ মারা যান।

সামরিক আইন প্রশাসকের তরফে এদিন কারফিউ জারি করা হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে পরদিন সকাল ৭টা পর্যন্ত এই কারফিউ পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়। সন্ধ্যায় এক সংবাদ সম্মেলন করেন শেখ মুজিবুর রহমান, যাতে নিরস্ত্রদের উপর গুলি বর্ষণের তীব্র নিন্দা করা হয়। পরদিন ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত সারাদেশে অর্ধদিবস (ভোর ৬টা থেকে দুপুর ২টা) হরতালের ডাক দেন মুজিব। পরদিন ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে বৈঠক শেষে পল্টনে এক সমাবেশের ঘোষণা দেন তিনি।

৩ মার্চ:

নিহতদের স্মরণে পালন করা হয় শোক দিবস। পল্টনে ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের সভায় প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধু আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন, "আমি থাকি আর না থাকি, বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন যেন থেমে না থাকে। বাঙালির রক্ত যেন বৃথা না যায়। আমি না থাকলে- আমার সহকর্মীরা নেতৃত্ব দিবেন। তাদেরও যদি হত্যা করা হয়, যিনি জীবিত থাকবেন, তিনিই নেতৃত্ব দিবেন। যে কোনো মূল্যে আন্দোলন চালাইয়া যেতে হবে- অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। "বঙ্গবন্ধু" আগেই ঘোষণা করেছিলেন, ৭ মার্চ রোববার রেসকোর্স ময়দানে তিনি পরবর্তী কর্মপন্থা ঘোষণা করবেন।

৪ মার্চ:

গণ বিক্ষোভে টালমাটাল ছিল ৪ মার্চ ১৯৭১। দিন যতই যাচ্ছিল এক দফার দাবি অর্থাৎ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এ দিন সামরিক জান্তার সান্ধ্যআইন ভঙ্গ করে রাজপথে নেমে আসে হাজার হাজার মানুষ। খুলনায় বাঙালি অবাঙালিদের মাঝে সংঘর্ষ হয় এই দিন। ঢাকায় আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সভায় হরতালে দমন পীড়নের নিন্দা জানানো হয়। লাগাতার হরতালের এই দিনে ঢাকাসহ সারা দেশ অচল হয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের নেত্রী কবি সুফিয়া কামাল ও মালেকা বেগম যৌথ বিবৃতিতে ৬ই মার্চ বায়তুল মোকাররম এলাকায় প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানান। এই দিনে ঘটে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই দিনে রেডিয়ো পাকিস্তান ঢাকা'র নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র'। সে দিনের সেই ঘটনা চলমান আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। যা আমাদের মুক্তির পথকে এগিয়ে নেয়।

৬ মার্চ:

৭ মার্চের একদিন আগে অর্থাৎ ৬ মার্চ জে. ইয়াহিয়া খান টেলিফোনে কথা বলেন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে। ৬ মার্চে এ ঘোষণা করা হলো যে, ২৫ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। পরিস্থিতির চাপে

ভীতসন্ত্রস্ত পূর্ব পাকিস্তান সামরিক সদর দপ্তর থেকে বিভিন্নভাবে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে এই মেসেজ দেয়া হয় যে, ৭ মার্চ যেন কোনোভাবেই স্বাধীনতা ঘোষণা না করা হয়। ৭ মার্চ জনসভাকে কেন্দ্র করে কামান বসানো হয়। এমনকি আধুনিক অস্ত্রসস্ত্র প্রস্তুত রাখা হয়। মেজর সিদ্দিক সালিক তার গ্রন্থে লিখেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি ৭ মার্চের জনসভার প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ নেতাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, "পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা হলে তা শক্তভাবে মোকাবেলা করা হবে। বিশ্বাসঘাতকদের (বাঙালি) হত্যার জন্য ট্যাংক, কামান, মেশিনগান সবই প্রস্তুত রাখা হবে। প্রয়োজন হলে ঢাকাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হবে। শাসন করার জন্য কেউ থাকবে না কিংবা শাসিত হওয়ার জন্যও কিছু থাকবে না।"

৭ মার্চ:

এমন এক কঠিন সংকটময় পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৭ মার্চ রেসকোর্সে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষকে চারটি শর্ত দিয়ে ভাষণের শেষাংশে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ

"আজ দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বুঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি- আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর ও যশোরের রাজপথ আমার ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে।

আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, তারা বাঁচতে চায়। তারা অধিকার পেতে চায়। নির্বাচনে আপনারা সম্পূর্ণভাবে আমাকে এবং আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছেন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য। আশা ছিল জাতীয় পরিষদ বসবে, আমরা শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এই শাসনতন্ত্রে মানুষ তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু ২৩ বছরের ইতিহাস বাংলার মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস বাংলার মানুষের মুমূর্ষু আর্তনাদের ইতিহাস, রক্ত দানের করুণ ইতিহাস। নির্যাতিত মানুষের কান্নার ইতিহাস। ১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয় লাভ করেও ক্ষমতায় বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারি করে আইয়ুব খান দশ বছর আমাদের গোলাম করে রাখলো। ১৯৬৬ সালে ৬-দফা দেয়া হলো এবং এরপর এ অপরাধে আমার বহু ভাইকে হত্যা করা হলো। ১৯৬৯ সালে গণ-আন্দোলনের মুখে আইয়ুবের পতনের পর ইয়াহিয়া খান এলেন। তিনি বললেন, তিনি জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবেন, শাসনতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তার পরের ঘটনা সকলেই জানেন। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনা হলো-আমরা তাকে ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার অনুরোধ করলাম। কিন্তু 'মেজরিটি' পার্টির নেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার কথা শুনলেন না। শুনলেন সংখ্যালঘু দলের ভুট্টো সাহেবের কথা। আমি শুধু বাংলার মেজরিটি পার্টির নেতা নই, সমগ্র পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা। ভুট্টো সাহেব বললেন, মার্চের প্রথম সপ্তাহে অধিবেশন ডাকতে, তিনি মার্চের ৩ তারিখে অধিবেশন ডাকলেন। আমি বললাম, তবুও আমরা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যাব এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি ন্যায্য কথা বলে আমরা তা মেনে নেব, এমনকি তিনি যদি একজনও হন। জনাব ভুট্টো ঢাকা এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা হলো। ভুট্টো সাহেব বলে গেছেন আলোচনার দরজা বন্ধ নয়; আরো আলোচনা হবে। মওলানা নুরানী ও মুফতি মাহমুদসহ পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য পার্লামেন্টারি নেতারা এলেন, তাদের সঙ্গে আলোচনা হলো- উদ্দেশ্য ছিলো আলাপ-আলোচনা করে শাসনতন্ত্র রচনা করবো। তবে তাদের আমি জানিয়ে দিয়েছি ৬-দফা পরিবর্তনের কোনো অধিকার আমার নেই, এটা জনগণের সম্পদ। কিন্তু ভুট্টো হুমকি দিলেন। তিনি বললেন, এখানে এসে 'ডবল জিম্মী' হতে পারবেন না। পরিষদ কসাই খানায় পরিণত হবে। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যদের প্রতি

হুমকি দিলেন যে, পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিলে রক্তপাত করা হবে, তাদের মাথা ভেঙে দেয়া হবে। হত্যা করা হবে। আন্দোলন শুরু হবে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত। একটি দোকানও খুলতে দেয়া হবে না। তা সত্ত্বেও পয়ত্রিশ জন পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্য এলেন। কিন্তু পয়লা মার্চ ইয়াহিয়া খান পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন। দোষ দেয়া হলো, বাংলার মানুষকে, দোষ দেয়া হলো আমাকে, বলা হলো আমার অনমনীয় মনোভাবের জন্যই কিছু হয়নি। এরপর বাংলার মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলো। আমি শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য হরতাল ডাকলাম। জনগণ আপন ইচ্ছায় পথে নেমে এলো। কিন্তু কি পেলাম আমরা? বাংলার নিরস্ত্র জনগণের উপর অস্ত্র ব্যবহার করা হলো। আমাদের হাতে অস্ত্র নেই। কিন্তু আমরা পয়সা দিয়ে যে অস্ত্র কিনে দিয়েছি বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সে অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে আমার নিরীহ মানুষদের হত্যা করার জন্য। আমার দুখি জনতার উপর চলছে গুলি। আমরা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যখনই দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে চেয়েছি, তখনই ষড়যন্ত্র চলেছে-আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ইয়াহিয়া খান বলেছেন, আমি নাকি ১০ই মার্চ তারিখে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে চেয়েছি, তাঁর সাথে টেলিফোনে আমার আলাপ হয়েছে। আমি তাঁকে বলেছি আপনি দেশের প্রেসিডেন্ট, ঢাকায় আসুন, দেখুন আমার গরীব জনসাধারণকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছে, আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। আমি আগেই বলে দিয়েছি কোনো গোলটেবিল বৈঠক হবে না। কিসের গোলটেবিল বৈঠক? কার গোলটেবিল বৈঠক? যারা আমার মা-বোনের কোল শূন্য করেছে তাদের সাথে বসবো আমি গোলটেবিল বৈঠকে? ৩রা মার্চ তারিখে পল্টনে আমি অসহযোগের আহ্বান জানালাম। বললাম, অফিস-আদালত, খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করুন। আপনারা মেনে নিলেন। হঠাৎ আমার সঙ্গে বা আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে একজনের সঙ্গে পাঁচ ঘণ্টা বৈঠকের পর ইয়াহিয়া খান যে বক্তৃতা করেছেন, তাতে সমস্ত দোষ আমার ও বাংলার মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। দোষ করলেন ভুট্টো- কিন্তু গুলি করে মারা হলো আমার বাংলার মানুষকে। আমরা গুলি খাই, দোষ আমাদের- আমরা বুলেট খাই, দোষ আমাদের। ইয়াহিয়া সাহেব অধিবেশন ডেকেছেন। কিন্তু আমার দাবি সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, হত্যার তদন্ত করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো পরিষদে বসবো

কি বসনো না। এ দাবি মানার আগে পরিষদে বসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, জনগণ আমাকে সে অধিকার দেয়নি। রক্তের দাগ এখনো শুকায়নি, শহিদদের রক্ত মাড়িয়ে ২৫ তারিখে পরিষদে যোগ দিতে যাব না। ভাইয়েরা, আমার উপর বিশ্বাস আছে? আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাইনা, মানুষের অধিকার চাই। প্রধান মন্ত্রীত্বের লোভ দেখিয়ে আমাকে নিতে পারেনি, ফাঁসীর কাষ্ঠে ঝুলিয়ে নিতে পারেনি। আপনারা রক্ত দিয়ে আমাকে ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন। সেদিন এই রেসকোর্সে আমি বলেছিলাম, রক্তের ঋণ আমি রক্ত দিয়ে শোধ করবো; মনে আছে? আজো আমি রক্ত দিয়েই রক্তের ঋণ শোধ করতে প্রস্তুত। আমি বলে দিতে চাই, আজ থেকে কোর্ট-কাচারী, হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অনির্দিষ্ট-কালের জন্য বন্ধ থাকবে। কোনো কর্মচারী অফিসে যাবেন না। এ আমার নির্দেশ। গরীবের যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য রিক্সা চলবে, ট্রেন চলবে আর সব চলবে। ট্রেন চলবে- তবে সেনাবাহিনী আনা-নেয়া করা যাবে না। করলে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তার জন্য আমি দায়ী থাকবো না। সেক্রেটারীয়েট, সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট সহ সরকারি, আধা-সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো বন্ধ থাকবে। শুধু পূর্ব বাংলার আদান-প্রদানের ব্যাঙ্কগুলো দু-ঘণ্টার জন্য খোলা থাকবে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা যেতে পারবে না। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন বাংলাদেশের মধ্যে চালু থাকবে। তবে, সাংবাদিকরা বহির্বিশ্বে সংবাদ পাঠাতে পারবেন। এদেশের মানুষকে খতম করা হচ্ছে, বুঝে শুনে চলবেন। দরকার হলে সমস্ত চাকা বন্ধ করে দেয়া হবে। আপনারা নির্ধারিত সময়ে বেতন নিয়ে আসবেন। যদি একটিও গুলি চলে তাহলে বাংলার ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলবেন। যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। রাস্তা ঘাট বন্ধ করে দিতে হবে। আমরা তাদের ভাতে মারবো-পানিতে মারবো। হুকুম দিবার জন্য আমি যদি না থাকি, আমার সহকর্মীরা যদি না থাকেন, আপনারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ কিছু বলবে না। গুলি চালালে আর ভালো হবে না। সাত কোটি মানুষকে আর দাবায়ে রাখতে পারবা না। বাঙালি মরতে শিখেছে, তাদের কেউ দাবাতে পারবে না। শহিদদের ও আহতদের পরিবারের জন্য আওয়ামী লীগ সাহায্য কমিটি করেছে। আমরা সাহায্যের চেষ্টা করবো। আপনারা যে যা পারেন দিয়ে যাবেন। সাত দিনের হরতালে যে সব শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছেন, কারফিউর জন্য কাজ করতে

পারেননি-শিল্প মালিকরা তাদের পুরো বেতন দিয়ে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। কাউকে যেন অফিসে দেখা না যায়। এ দেশের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ থাকবে। আপনারা আমার উপর ছেড়ে দেন, আন্দোলন কিভাবে করতে হয় আমি জানি। কিন্তু হুঁশিয়ার, একটা কথা মনে রাখবেন, আমাদের মধ্যে শত্রু ঢুকেছে, ছদ্মবেশে তারা আত্মকলহের সৃষ্টি করতে চায়। বাঙালি-অবাঙালি, হিন্দু-মুসলমান সবাই আমাদের ভাই, তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। রেডিয়ো, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র যদি আমাদের আন্দোলনের খবর প্রচার না করে তবে কোন বাঙালি রেডিয়ো এবং টেলিভিশনে যাবেন না। শান্তিপূর্ণভাবে ফয়সালা করতে পারলে ভাই ভাই হিসাবে বাস করার সম্ভাবনা আছে, তা না হলে নেই। বাড়াবাড়ি করবেন না, মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। প্রস্তুত থাকবেন, ঠান্ডা হলে চলবে না। আন্দোলন ও বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন। আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়লে তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। শৃঙ্খলা ছাড়া কোনো জাতি সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারে না। আমার অনুরোধ প্রত্যেক গ্রামে, মহল্লায়, ইউনিয়নে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন। হাতে যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।

“এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম”

“জয় বাংলা”

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মানুষের যতগুলো অনুভূতি আছে তার মাঝে সবচেয়ে সুন্দর অনুভূতি হচ্ছে ভালোবাসা। আর এই পৃথিবীতে যা কিছুকে ভালোবাসা সম্ভব তার মাঝে সবচেয়ে তীব্র ভালোবাসাটুকু হতে পারে শুধুমাত্র মাতৃভূমির জন্যে। যারা কখনো নিজের মাতৃভূমির জন্যে ভালোবাসাটুকু অনুভব করেনি তাদের মতো দুর্ভাগা আর কেউ নেই। আমাদের খুব সৌভাগ্য আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে যে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল তার ইতিহাস হচ্ছে গভীর আত্মত্যাগের ইতিহাস, অবিশ্বাস্য সাহস ও বীরত্বের ইতিহাস এবং বিশাল এক অর্জনের ইতিহাস। যখন কেউ এই আত্মত্যাগ, বীরত্ব আর অর্জনের ইতিহাস জানবে, তখন সে যে শুধুমাত্র দেশের জন্যে একটি গভীর ভালোবাসা আর মমতা অনুভব করবে তা নয়, এই দেশ, এই মানুষের কথা ভেবে গর্বে তার বুক ফুলে উঠবে।

পূর্ব ইতিহাসঃ

যে কোনো কিছু বর্ণনা করতে হলে সেটি একটু আগে থেকে বলতে হয়, তাই বাংলাদেশের ইতিহাস জানার জন্যেও একটু আগে গিয়ে ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করা যেতে পারে। ব্রিটিশরা এই অঞ্চলটিকে প্রায় দুইশ বছর শাসন-শোষণ করেছে। তাদের হাত থেকে স্বাধীনতার জন্যে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছে, জেল খেটেছে, দ্বীপান্তরে গিয়েছে। ১৯৪০ সালে ‘লাহোর প্রস্তাব’-এ ঠিক করা হয়েছিল ভারতবর্ষের যে অঞ্চলগুলোতে মুসলমান বেশি, সেরকম দুটি অঞ্চলকে নিয়ে দুটি দেশ এবং বাকি অঞ্চলটিকে নিয়ে আর একটি দেশ তৈরি করা হবে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট যে এলাকা দুটিতে মুসলমানরা বেশি সেই এলাকা দুটি নিয়ে দুটি ভিন্ন দেশ না হয়ে পাকিস্তান নামে একটি দেশ এবং ১৫ আগস্ট বাকি অঞ্চলটিকে ভারত নামে অন্য একটি দেশে ভাগ করে দেয়া হলো। পাকিস্তান নামে পৃথিবীতে তখন অত্যন্ত বিচিত্র একটি দেশের জন্ম হলো, যে দেশের দুটি অংশ দুই জায়গায়। এখন যেটি পাকিস্তান সেটির নাম পশ্চিম পাকিস্তান এবং এখন যেটি বাংলাদেশ তার নাম পূর্ব পাকিস্তান। মাঝখানে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দূরত্ব এবং সেখানে রয়েছে ভিন্ন একটি দেশ- ভারত।

বিভেদ, বৈষম্য, শোষণ আর ষড়যন্ত্রঃ

পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে শুধু যে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দূরত্ব তা নয়, মানুষগুলোর ভেতরেও ছিল বিশাল দূরত্ব। তাদের চেহারা, ভাষা, খাবার, পোশাক, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সবকিছু ছিল ভিন্ন, শুধু একটি বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষগুলোর মাঝে মিল ছিল- সেটি হচ্ছে ধর্ম। এরকম বিচিত্র একটি দেশ হলে সেটি টিকিয়ে রাখার জন্যে আলাদাভাবে একটু বেশি চেষ্টা করার কথা, কিন্তু পাকিস্তানের শাসকেরা সেই চেষ্টা করল না। দেশভাগের সময় পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল দুই কোটি, পূর্ব পাকিস্তানের ছিল চার কোটি, কাজেই সহজ হিসেবে বলা যায় শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পুলিশ-মিলিটারি, সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তা সবকিছুতেই যদি একজন পশ্চিম পাকিস্তানের লোক থাকে, তাহলে সেখানে দুইজন পূর্ব পাকিস্তানের লোক থাকা উচিত। বাস্তবে হলো ঠিক তার উল্টো, সবকিছুতেই পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগ ছিল শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ। বাজেটের ৭৫% ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানে, ২৫% ব্যয় হতো পূর্ব পাকিস্তানে, যদিও পূর্ব পাকিস্তান থেকে রাজস্ব আয় ছিল বেশি, শতকরা ৬২ ভাগ। সবচেয়ে ভয়ংকর ছিল সেনাবাহিনীর সংখ্যা, পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যের সংখ্যা ছিল ২৫ গুণ বেশি।

ভাষা আন্দোলনঃ

অর্থনৈতিক নিপীড়ন থেকে অনেক বড় নিপীড়ন হচ্ছে একটি জাতির ভাষা, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের ওপর নিপীড়ন আর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ঠিক সেটিই শুরু করেছিল। পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল ১৯৪৭ সালে আর ঠিক ১৯৪৮ সালেই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা এসে ঘোষণা করলেন উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা তার প্রতিবাদ করে বিক্ষোভ শুরু করে দিল। আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিল রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার এবং আরো অনেকে। তারপরেও সেই আন্দোলনকে থামানো যায়নি, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল। যেখানে আমাদের ভাষাশহিদরা প্রাণ দিয়েছিলেন, সেখানে এখন আমাদের প্রিয়

শহিদ মিনার, আর ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখটি শুধু বাংলাদেশের জন্যে নয়, এখন সারা পৃথিবীর মানুষের জন্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

সামরিক শাসন:

একেবারে গোড়া থেকেই পাকিস্তানে শাসনের এক ধরনের ষড়যন্ত্র হতে থাকে, আর সেই ষড়যন্ত্রের সবচেয়ে বড় খেলোয়াড় ছিল সেনাবাহিনী। দেশের বাজেটের ৬০% ব্যয় করা হতো সেনাবাহিনীর পিছনে, তাই তারা তাদের অর্থ, বিত্ত, ক্ষমতা, সুবিধার লোভনীয় জীবন বেসামরিক মানুষের হাতে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল না। নানারকম টালবাহানা করে রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের সেনাপতি আইয়ুব খান পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করে নেন। সেই ক্ষমতায় তিনি একদিন দুইদিন ছিলেন না, ছিলেন টানা এগারো বৎসর। সামরিক শাসন কখনো কোথাও শুভ কিছু আনতে পারে না, সারা পৃথিবীতে একটিও উদাহরণ নেই যেখানে সামরিক শাসন একটি দেশকে এগিয়ে নিতে পেরেছে- আইয়ুব খানও পারেনি।

ছয় দফা:

দেশে সামরিক শাসন, তার ওপর পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ওপর এতরকম বঞ্চনা, কাজেই বাঙালিরা সেটি খুব সহজে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। বাঙালিদের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের তেজস্বী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের জন্যে স্বায়ত্তশাসন দাবি করে ১৯৬৬ সালে ৬দফা ঘোষণা করলেন। ছয় দফা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের সবকরম অর্থনৈতিক শোষণ, বঞ্চনা আর নিপীড়ন থেকে মুক্তির এক অসাধারণ দলিল। তখন পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের ওপর যেরকম অত্যাচার নির্যাতন চলছিল, তার মাঝে ছয় দফা দিয়ে স্বায়ত্তশাসনের মতো একটি দাবি তোলায় খুব সাহসের প্রয়োজন। ছয় দফার দাবি করার সাথে সাথেই আওয়ামী লীগের ছোট বড় সব নেতাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে দেয়া হলো। শুধু তাই নয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে একটি কঠিন শাস্তি দেয়ার জন্যে তাঁকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে দেশদ্রোহিতার একটি মামলার প্রধান আসামি করে দেয়া হলো।

পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা কিছুতেই এটা মেনে নিল না এবং সারাদেশে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। জেল-জুলুম, পুলিশ, ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)-এর গুলি, কিছুই বাকি থাকল না, কিন্তু সেই আন্দোলনকে থামিয়ে রাখা গেল না। আন্দোলনের নেতৃত্ব দিল ছাত্ররা, তাদের ছিল এগারো দফা দাবি। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন জেলের বাইরে, তিনিও এগিয়ে এলেন। দেখতে দেখতে সেই আন্দোলন একটি গণবিস্ফোরণে রূপ নিল কার সাধ্যি তাকে থামায়? ৬৯-এর গণআন্দোলনে প্রাণ দিয়েছিল ফুটফুটে কিশোর মতিউর, প্রাণ দিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদ যার নামে আইয়ুব গেটের নাম হয়েছিল আসাদ গেট। পাকিস্তান সরকার শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ সব নেতাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো। শুধু তাই নয়, প্রবল পরাক্রমশালী প্রেসিডেন্ট আইয়ুর খান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতা দিয়ে বিদায় নিল।

তারিখটি ছিল ১৯৬৯-এর ২৫ মার্চ, কেউ তখন জানত না ঠিক দুই বছর পর একই দিনে এই দেশের মাটিতে পৃথিবীর জঘন্যতম একটি গণহত্যা শুরু হবে।

পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন:

জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসেই পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম সাধারণ নির্বাচন দেবার কথা ঘোষণা করে, তারিখটি শেষ পর্যন্ত ঠিক করা হয় ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর নির্বাচনের কিছুদিন আগে ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের উপকূল এলাকায় পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে গেল- এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় দশ লক্ষ লোক মারা গেল। এত বড় একটি ঘটনার পর পাকিস্তান সরকারের যেভাবে সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত ছিল, তারা মোটেও সেভাবে এগিয়ে এল না। ঘূর্ণিঝড়ের পরেও যারা কোনোভাবে বেঁচে ছিল তাদের অনেকে মারা গেল খাবার আর পানির অভাবে। ঘূর্ণিঝড়ে কষ্ট পাওয়া মানুষগুলোর প্রতি এরকম অবহেলা আর নিষ্ঠুরতা দেখে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সরকারের প্রতি বিতৃষ্ণা আর ঘৃণায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। প্রচণ্ড ক্ষোভে মাওলানা ভাসানী একটি প্রকাশ্য সভায় স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবি করে একটি ঘোষণা দিয়ে দিলেন।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সারা পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বড় বড় জেনারেলের রাজনৈতিক নেতাদের জন্যে কোনো শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। তারা ধরেই নিয়েছিল, নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না, তাই দলগুলো নিজেদের ভেতর ঝগড়াঝাটি আর কোন্দল করতে থাকবে আর সেটিকে কারণ হিসেবে দেখিয়ে সেনাবাহিনী ক্ষমতায় থেকে দেশটাকে লুটেপুটে খাবে। কাজেই নির্বাচনের ফলাফল দেখে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, ফলাফলটি ছিল অবিশ্বাস্য- পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২ আসনের ভেতরে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটের ব্যবধানে ১৬০টি আসন পেয়েছে। যখন সকল আসনে নির্বাচন শেষ হলো তখন দেখা গেল, মনোনীত মহিলা আসনসহ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মাঝে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি, পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল পিপল্‌স পার্টি ৮৮টি এবং অন্যান্য সব দল মিলে পেয়েছে বাকি ৫৮টি আসন।

সোজা হিসেবে এই প্রথম পাকিস্তান শাসন করবে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ। বঙ্গবন্ধু পরিষ্কার করে বলে দিলেন, তিনি ছয় দফার কথা বলে জনগণের ভোট পেয়েছেন এবং তিনি শাসনতন্ত্র রচনা করবেন ছয় দফার ভিত্তিতে, দেশ শাসিত হবে ছয় দফার ভিত্তিতে।

পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, কোনোভাবেই বাঙালিদের হাতে পাকিস্তানের শাসনভার তুলে দেয়া যাবে না। নিজের অজান্তেই জেনারেল ইয়াহিয়া খান আর তার দলবল 'বাংলাদেশ' নামে নতুন একটি রাষ্ট্র জন্ম দেবার প্রক্রিয়া শুরু করে দিল।

ষড়যন্ত্রঃ

জেনারেলদের ষড়যন্ত্রে সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী ছিল সেনাশাসক আইয়ুব খানের একসময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পশ্চিম পাকিস্তানের পিপল্‌স পার্টির সভাপতি জুলফিকার আলী ভুট্টো। হঠাৎ করে জুলফিকার আলী ভুট্টো জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে লারকানায় 'পাখি শিকার' করতে আমন্ত্রণ জানাল। 'পাখি শিকার' করতে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে যোগ দিল পাকিস্তানের বাঘা বাঘা জেনারেল। বাঙালিদের হাতে কেমন করে ক্ষমতা না দেয়া যায় সেই ষড়যন্ত্রের নীল নকশা সম্ভবত সেখানেই তৈরি হয়েছিল।

ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র চলতে থাকলেও জেনারেল ইয়াহিয়া খান সেটি বাইরে বোঝাতে চাইল না। তাই সে ১৩ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করল ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হবে। সবাই তখন গভীর আগ্রহে সেই দিনটির জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে।

এর মাঝে ১৯৭১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালিদের ভালোবাসা এবং মমতার শহিদ দিবস উদযাপিত হলো অন্য এক ধরনের উন্মাদনায়। শহিদ মিনারে সেদিন মানুষের ঢল নেমেছে, তাদের বুকের ভেতর এর মাঝেই জন্ম নিতে শুরু করেছে স্বাধীনতার স্বপ্ন। ২১শে ফেব্রুয়ারিতে বাঙালিদের সেই উন্মাদনা দেখে পাকিস্তান সেনাশাসকদের মনের ভেতরে যেটুকু দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল সেটিও দূর হয়ে গেল। জুলফিকার আলী ভুট্টো ছিল সংখ্যালঘু দলে, তার ক্ষমতার অংশ পাবার কথা নয়, কিন্তু সে ক্ষমতার জন্যে বেপরোয়া হয়ে উঠল। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের ঠিক দুই দিন আগে ১ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে দিল। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের বুকের ভেতর ক্ষোভের যে বারুদ জমা হয়েছিল, সেখানে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্পর্শ করল। সারাদেশে বিক্ষোভের যে বিস্ফোরণ ঘটল তার কোনো তুলনা নেই।

উত্তাল মার্চঃ

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হয়ে গেছে, এ ঘোষণাটি যখন রেডিয়োতে প্রচার করা হয়েছে, তখন ঢাকা স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের সাথে কমনওয়েলথ একাদশের খেলা চলছে। মুহূর্তের মাঝে জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, ঢাকা স্টেডিয়াম হয়ে ওঠে একটি যুদ্ধক্ষেত্র। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, দোকান-পাট সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে নেমে আসে, পুরো ঢাকা শহর দেখতে দেখতে একটি মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়ে যায়। মানুষের মুখে তখন উচ্চারিত হতে থাকে স্বাধীনতার স্লোগান : 'জয় বাংলা' 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।'

বঙ্গবন্ধু ঢাকা এবং সারাদেশে মিলিয়ে ৫ দিনের জন্যে হরতাল ও অনির্দিষ্টকালের জন্যে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। সেই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সরকারকে কোনোভাবে সাহায্য না করার কথা বলেছিলেন এবং তাঁর মুখের একটি কথায় সারা পূর্ব পাকিস্তান অচল হয়ে গেল।

অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্যে কারফিউ দেয়া হলো, ছাত্র জনতা সেই কারফিউ ভেঙে পথে নেমে এল। চারিদিকে মিছিল, স্লোগান আর বিক্ষোভ, সেনাবাহিনীর গুলিতে মানুষ মারা যাচ্ছে তারপরেও কেউ থেমে রইল না, দলে দলে সবাই পথে নেমে এল।

২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা তোলা হলো। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের জনসভায় জাতীয় সংগীত হিসেবে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আমার সোনার বাংলা’ গানটি নির্বাচন করা হলো।

পাঁচদিন হরতালের পর ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভাষণ দিতে এলেন। ততদিনে পুরো পূর্ব পাকিস্তান চলছে বঙ্গবন্ধুর কথায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর ভাষণ শুনতে এসেছে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান আক্ষরিক অর্থে একটি জনসমুদ্র। বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করলেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম ভাষণ খুব বেশি দেয়া হয়নি। এই ভাষণটি সেদিন দেশের সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় অকাতরে প্রাণ দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার শক্তি জুগিয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর ডাকে একদিকে যখন সারাদেশে অসহযোগ আন্দোলন চলছে অন্যদিকে প্রতিদিন দেশের আনাচে কানাচে পাকিস্তান মিলিটারির গুলিতে শত শত মানুষ মারা যাচ্ছে। পাকিস্তান মিলিটারির গতিবিধি থামানোর জন্যে ছাত্র-শ্রমিক-জনতা পথে পথে ব্যারিকেড গড়ে তুলছে। সারাদেশে ঘরে ঘরে কালো পতাকার সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। দেশের ছাত্র-জনতা স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য ট্রেনিং নিচ্ছে। মওলানা ভাসানী ৯ মার্চ পল্টন ময়দানের জনসভায় পরিষ্কার ঘোষণা দিয়ে বলে দিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানিরা যেন আলাদা করে তাদের শাসনতন্ত্র তৈরি করে, কারণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ একটি স্বাধীন দেশের জন্ম দিয়ে নিজেদের শাসনতন্ত্র নিজেরাই তৈরি করে নেবে।

ঠিক এই সময়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান গণহত্যার প্রস্তুতি শুরু করে দিল। বেলুচিস্তানের কসাই নামে পরিচিত জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করে পাঠাল, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের কোনো বিচারপতি তাকে গভর্নর হিসেবে শপথ করাতে রাজি হলেন না। ইয়াহিয়া খান নিজে মার্চের ১৫ তারিখ

ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার ভান করতে থাকে, এর মাঝে প্রত্যেক দিন বিমানে করে ঢাকায় সৈন্য আনা হতে থাকে। যুদ্ধজাহাজে করে অস্ত্র এসে চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করে, কিন্তু জনগণের বাধার কারণে সেই অস্ত্র তারা নামাতে পারছিল না। ২১ মার্চ এই ষড়যন্ত্রে ভুট্টো যোগ দিল, সদলবলে ঢাকা পৌঁছে সে আলোচনার ভান করতে থাকে।

১৯ মার্চ জয়দেবপুরে বাঙালি সেনারা বিদ্রোহ করে বসে। তাদের থামানোর জন্যে ঢাকা থেকে যে সেনাবাহিনী পাঠানো হয় তাদের সাথে সাধারণ জনগণের সংঘর্ষে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায়। ২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস, কিন্তু সেনাবাহিনীর ক্যান্টনমেন্ট আর গভর্নমেন্ট হাউজ ছাড়া সারা বাংলাদেশে কোথাও পাকিস্তানের পতাকা খুঁজে পাওয়া গেল না। ধানমণ্ডিতে বঙ্গবন্ধুর বাসাতেও সেদিন ‘আমার সোনার বাংলা’ গানের সাথে সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলা হলো।

পরদিন ২৪ মার্চ, সারাদেশে একটি থমথমে পরিবেশ মনে হয় এই দেশের মাটি, আকাশ, বাতাস আগেই গণহত্যার খবরটি জেনে গিয়ে গভীর আশঙ্কায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করেছিল।

অপারেশন সার্চলাইট:

গণহত্যার জন্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ তারিখটা বেছে নিয়েছিল কারণ সে বিশ্বাস করত এটা তার জন্যে একটি শুভদিন। দুই বছর আগে এই দিনে সে আইয়ুব খানের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছিল। ২৫ মার্চ রাতে বাংলাদেশের ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম গণহত্যার আদেশ দিয়ে সে সন্ধ্যাবেলা পশ্চিম পাকিস্তানে যাত্রা শুরু করে দিল। জেনারেল ইয়াহিয়া খান সেনাবাহিনীকে বলেছিল, ৩০ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা কর, তখন দেখবে তারা আমাদের হাত চেটে খাবে! গণহত্যার নিখুঁত পরিকল্পনা অনেক আগে থেকে করা আছে সেই নীল নকশার নাম অপারেশন সার্চলাইট, সেখানে স্পষ্ট করে লেখা আছে কেমন করে আলাপ আলোচনার ভান করে কালক্ষেপণ করা হবে, কীভাবে বাঙালি সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করা হবে, কীভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ করা হবে, সোজা কথায়, কীভাবে একটি জাতিকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

শহরের প্রতিটি রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে রাখা হয়েছে, লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে দেরি হবে তাই নির্দিষ্ট সময়ের আগেই রাত সাড়ে এগারোটায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী

অপারেশন সার্চলাইটের কাজ শুরু করে দিল। শুরু হলো পৃথিবীর জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ, এই হত্যাযজ্ঞের যেন কোনো সাক্ষী না থাকে সেজন্যে সকল বিদেশি সাংবাদিককে দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। তারপরেও সাইমন ড্রিং নামে একজন অত্যন্ত দুঃসাহসী সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঢাকা শহরে লুকিয়ে এই ভয়াবহ গণহত্যার খবর ওয়াশিংটন পোস্টের মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে জানিয়েছিলেন।

ঢাকা শহরের নিরীহ মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে পাকিস্তান মিলিটারি সব বাঙালি অফিসারকে হয় হত্যা না হয় গ্রেপ্তার করে নেয়, সাধারণ সৈন্যদের নিরস্ত্র করে রাখে। পিলখানায় ই.পি. আরদেরকেও নিরস্ত্র করা হয়েছিল, তারপরেও তাদের যেটুকু সামর্থ্য ছিল সেটি নিয়ে সারারাত যুদ্ধ করেছে। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পুলিশদের নিরস্ত্র করা সম্ভব হয়নি এবং এই পুলিশবাহিনীই সবার আগে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে সত্যিকার একটি যুদ্ধ শুরু করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী অনেক ক্ষতির স্বীকার হয়ে পিছিয়ে গিয়ে ট্যাংক, মর্টার, ভারী অস্ত্র, মেশিনগান নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করে শেষ পর্যন্ত রাজারবাগ পুলিশ লাইনের নিয়ন্ত্রণ নেয়।

২৫ মার্চের বিভীষিকার কোনো শেষ নেই। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এসে ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) আর জগন্নাথ হলের সব ছাত্রকে হত্যা করল। হত্যার আগে তাদের দিয়েই জগন্নাথ হলের সামনে একটি গর্ত করা হয়, যেখানে তাদের মৃতদেহকে মাটি চাপা দেয়া হয়। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যটি বুয়েটের প্রফেসর নূর উল্লাহ তাঁর বাসা থেকে যে ভিডিও করতে পেরেছিলেন, সেটি এখন ইন্টারনেটে মুক্তিযুদ্ধের আর্কাইভে সংরক্ষিত আছে, পৃথিবীর মানুষ চাইলেই নিজের চোখে সেটি দেখতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু ছাত্রদের নয় সাধারণ কর্মচারী এমনকি শিক্ষকদেরকেও তারা হত্যা করে। আশেপাশে যে বস্তিগুলো ছিল সেগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে মেশিনগানের গুলিতে অসহায় মানুষগুলোকে হত্যা করে। এরপর তারা পুরান ঢাকার হিন্দুপ্রধান এলাকাগুলো আক্রমণ করে, মন্দিরগুলো গুঁড়িয়ে দেয়, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। যারা পালানোর চেষ্টা করেছে সবাইকে পাকিস্তান মিলিটারি গুলি করে হত্যা করেছে। ২৫ মার্চ ঢাকা শহর ছিল নরকের মতো, যেদিকে তাকানো যায় সেদিকে আগুন আর আগুন, গোলাগুলির শব্দ আর

মানুষের আর্তচিৎকার।

অপারেশন সার্চলাইটের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। আগেই খবর পেয়ে তিনি তাঁর দলের সব নেতাকে সরে যাবার নির্দেশ দিয়ে নিজে বসে রইলেন নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্যে।

স্বাধীন বাংলাদেশ:

কমান্ডো বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে ধরে নিয়ে যাবার আগে তিনি বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণায় তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার আহবান জানিয়ে গেলেন। তাঁর ঘোষণাটি তৎকালীন ই.পি.আর এর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। যখন ঘোষণাটি প্রচারিত হয় তখন মধ্যরাত পার হয়ে ২৬ মার্চ হয়ে গেছে, তাই আমাদের স্বাধীনতা দিবস হচ্ছে ২৬ মার্চ।

পূর্ব পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চিরদিনের জন্যে মুছে গেল, জন্ম নিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। কিন্তু সেই বাংলাদেশ তখনো ব্যথাতুর, যন্ত্রণাকাতর। তার মাটিতে তখনো রয়ে গেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুর দানবেরা।

প্রতিরোধ আর প্রতিরোধ:

ঢাকা শহরে পৃথিবীর একটি নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ২৭ মার্চ সকাল আটটা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল করা হলে শহরের ভয়ার্ত নারী-পুরুষ-শিশু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য গ্রামের দিকে ছুটে যেতে লাগল। জেনারেল টিক্কা খান ভেবেছিল সে যেভাবে ঢাকা শহরকে দখল করেছে, এভাবে সারা বাংলাদেশকে এপ্রিলের দশ তারিখের মধ্যে দখল করে নেবে। কিন্তু বাস্তবে সেটি সম্ভব হলো না। বিভিন্ন এলাকা থেকে পালিয়ে আসা বাঙালি সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরা, এই দেশের ছাত্র-জনতা সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তার কোনো তুলনা নেই।

চট্টগ্রামে বাঙালি সেনাবাহিনী এবং ই.পি.আর বিদ্রোহ করে শহরের বড় অংশের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে আবার স্বাধীনতার

ঘোষণা পড়ে শোনান। এই ঘোষণাটি সেই সময় বাংলাদেশের সবার ভেতরে নতুন একটি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। চট্টগ্রাম শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার জন্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে যুদ্ধজাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ করতে হয় এবং বিমান আক্রমণ চালাতে হয়। বাঙালি যোদ্ধাদের হাত থেকে চট্টগ্রাম শহরকে পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এপ্রিল মাসের ১০ তারিখ হয়ে যায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী কুষ্টিয়া এবং পাবনা শহর প্রথমে দখল করে নিলেও বাঙালি সৈন্যরা তাদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে শহরগুলো পুনর্দখল করে এপ্রিলের মাঝামাঝি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। বগুড়া দিনাজপুরেও একই ঘটনা ঘটে। বাঙালি সৈন্যরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাত থেকে শহরগুলোকে পুনর্দখল করে নেয়। যশোরে বাঙালি সৈনদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করার সময় তারা বিদ্রোহ করে, প্রায় অর্ধেক সৈন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে প্রাণ হারালেও বাকিরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুক্ত হয়ে আসতে পারে। কুমিল্লা, খুলনা ও সিলেট শহর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিজেদের দখলে রাখলেও বাঙালি সৈন্যরা তাদের আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই সময়ে পাকিস্তান থেকে দুইটি ডিভিশন সৈন্য বাংলাদেশে নিয়ে আসে। এছাড়াও পরবর্তী সময়ে অসংখ্য মিলিশিয়া বাহিনী আনা হয়, তার সাথে সাথে আনা হয় যুদ্ধজাহাজে করে অস্ত্র আর গোলা বারুদ। বিশাল অস্ত্রসম্ভার এবং বিমানবাহিনীর সাহায্য নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশের ভেতরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মে মাসের মাঝামাঝি তারা শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের বড় বড় শহর নিজেদের দখলে নিয়ে আসতে পারে।

পাকিস্তান সরকার ১১ এপ্রিল টিক্কা খানের পরিবর্তে জেনারেল এ.এ.কে নিয়াজীকে সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব দিয়ে পাঠায়। মুক্তিযোদ্ধারা তখন যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করার জন্যে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।

শরণার্থী:

২৫ মার্চের গণহত্যা শুরু করার পর বাংলাদেশে কেউই নিরাপদ ছিল না। তবে আওয়ামী লীগের কর্মী বা সমর্থক আর হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রাগ ছিল সবচেয়ে বেশি। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারে এরকম তরুণেরাও সেনাবাহিনার লক্ষ্যবস্তু ছিল। সবচেয়ে বেশি আতঙ্কের মাঝে ছিল

কমবয়সি মেয়েরা। সেনাবাহিনীর সাথে সাথে বাংলাদেশের বিহারি জনগোষ্ঠীও বাঙালি নিধনে যোগ দিয়েছিল এবং তাদের ভয়ংকর অত্যাচারে এই দেশের বিশাল এক জনগোষ্ঠী পাশের দেশ ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। জাতিসংঘ কিংবা নিউজ উইকের হিসেবে মোট শরণার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় এক কোটি। সে সময় বাংলাদেশের জনসংখ্যাই ছিল মাত্র সাত কোটি যার অর্থ দেশের প্রতি সাতজন মানুষের মাঝে একজনকেই নিজের দেশ ও বাড়িঘর ছেড়ে শরণার্থী হিসেবে পাশের দেশে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

ভারত এই বিশাল জনসংখ্যাকে আশ্রয় দিয়েছিল, কিন্তু তাদের ভরণপোষণ করতে গিয়ে প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়েছিল। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু আগরতলায় মোট অধিবাসী থেকে শরণার্থীর সংখ্যা ছিল বেশি। শরণার্থীদের জীবন ছিল খুবই কষ্টের, খাবার অভাব, থাকার জায়গা নেই, রোগে শোকে জর্জরিত, কলেরা, ডায়রিয়া এরকম রোগে অনেক মারা যায়। ছোট শিশু এবং বৃদ্ধদের সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হয়েছিল। দেখা গিয়েছিল, যুদ্ধ শেষে কোনো কোনো শরণার্থী ক্যাম্পে একটি শিশুও আর বেঁচে নেই।

বাংলাদেশ সরকার:

একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের আকাঙ্ক্ষা এই দেশের মানুষের বুকের মাঝে জাগিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে যে মানুষটি এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন তাজউদ্দিন আহমেদ। তিনি তাঁর পরিবারের সবাইকে তাঁদের নিজেদের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে ৩০ মার্চ সীমান্ত পাড়ি দেন। তখন তাঁর সাথে অন্য কোনো নেতাই ছিলেন না, পরে তিনি তাঁদের সবার সাথে যোগাযোগ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন। এপ্রিলের ১০ তারিখ মুজিবনগর থেকে ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সনদ ঘোষণা করা হয়। এই সনদটি দিয়েই বাংলাদেশ নৈতিক এবং আইনগতভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই নতুন রাষ্ট্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি ও বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে (মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা) বাংলাদেশের প্রথম সরকার দেশি বিদেশি সাংবাদিকদের সামনে শপথ গ্রহণ করে তাদের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে।

তাদের প্রথম দায়িত্ব বাংলাদেশের মাটিতে রয়ে যাওয়া পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করা।

পাল্টা আঘাত:

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধগুলো ছিল পরিকল্পনাহীন এবং অপ্রস্তুত। ধীরে ধীরে মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের সংগঠিত করে পালটা আঘাত হানতে শুরু করে। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফের দায়িত্ব দেয়া হয় কর্নেল (অবঃ) এম.আতাউল গণি ওসমানীকে, চিফ অফ স্টাফ করা হয় লে. কর্নেল আবদুর রবকে এবং ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে.খন্দকারকে। পুরো বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। ১নং সেক্টরের (চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম) কমান্ডার ছিলেন প্রথমে মেজর জিয়াউর রহমান, পরে মেজর রফিকুল ইসলাম। ২নং সেক্টরের (নোয়াখালী, কুমিল্লা, দক্ষিণ ঢাকা, আংশিক ফরিদপুর) কমান্ডার প্রথমে ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ, তারপর ক্যাপ্টেন আব্দুস সালেক চৌধুরী এবং সবশেষে ক্যাপ্টেন এ.টি.এম হায়দার। ৩নং সেক্টরের (উত্তর ঢাকা, সিলেট ও ময়মনসিংহের অংশবিশেষ) কমান্ডার প্রথমে ছিলেন মেজর কে.এম সফিউল্লাহ এবং তারপর মেজর এ.এন.এম. নুরুজ্জামান। ৪, ৫ এবং ৬নং সেক্টরের (যথাক্রমে দক্ষিণ সিলেট, উত্তর সিলেট এবং রংপুর, দিনাজপুর) কমান্ডার যথাক্রমে মেজর সি.আর.দত্ত, মেজর মীর শওকত আলী এবং উইং কমান্ডার এম. কে বাশার। ৭নং সেক্টরের (রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা) কমান্ডার ছিলেন মেজর নাজমুল হক, একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর পর মেজর কাজী নুরুজ্জামান সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব নেন। ৮নং সেক্টরের (কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর) কমান্ডার প্রথমে ছিলেন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, এবং তারপর মেজর এম.এ মনজুর। ৯নং সেক্টরের (খুলনা, বরিশাল) কমান্ডার ছিলেন মেজর এম.এ.জলিল। ১০নং সেক্টর ছিল নৌ-অঞ্চলের জন্যে, সেটি ছিল সরাসরি কমান্ডার ইন চিফের অধীনে। কোনো অফিসার ছিল না বলে এই সেক্টরের কোনো কমান্ডার ছিল না। নৌ-কমান্ডোরা যখন যে সেক্টরে তাদের অভিযান চালাতেন, তখন সেই সেক্টর কমান্ডারের অধীনে কাজ করতেন। এই নৌ-কমান্ডোরা অপারেশন জ্যাকপটের অধীনে একটি অবিশ্বাস্য দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নিয়ে আগস্টের ১৫ তারিখ চট্টগ্রামে অনেকগুলো জাহাজ মাইন দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১১নং সেক্টরের (টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ) কমান্ডার

ছিলেন মেজর এম.আবু তাহের, নভেম্বরে একটি সম্মুখযুদ্ধে আহত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি এর দায়িত্ব পালন করেন।

এই এগারোটি সেক্টর ছাড়াও জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ এবং শফিউল্লাহর নেতৃত্বে তাঁদের ইংরেজি নামের আদ্যাক্ষর ব্যবহার করে জেড ফোর্স, কে ফোর্স এবং এস ফোর্স নামে তিনটি ব্রিগেড তৈরি করা হয়। এছাড়াও টাঙ্গাইল আব্দুল কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে একটি অঞ্চলভিত্তিক বাহিনী ছিল। তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যে তিনি যে শুধু কাদেরিয়া বাহিনী নামে একটি অত্যন্ত সুসংগঠিত বাহিনী গড়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন তা নয়, এই বাহিনীকে সাহায্য করার জন্যে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও গড়ে তুলেছিলেন। যুদ্ধের শেষের দিকে সশস্ত্রবাহিনীর সাথে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীও যোগ দিয়েছিল এবং এই যুদ্ধে প্রথম বিমান আক্রমণের কৃতিত্বও ছিল বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান মিলিটারির নাকের ডগায় ঢাকা শহরে দুঃসাহসিক গেরিলা অপারেশন করে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ক্র্যাক প্লাটুন নামে দুঃসাহসী তরুণ গেরিলাযোদ্ধার একটি দল।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল সত্যিকার অর্থে একটি জনযুদ্ধ। এই দেশের অসংখ্য ছাত্র-জনতা-কৃষক-শ্রমিক যোগ দেয় সমতল ও পাহাড়ী আদিবাসী মানুষ। মুক্তিযোদ্ধাদের পায়ে জুতো কিংবা গায়ে কাপড় ছিল না, প্রয়োজনীয় অস্ত্র ছিল না এমনকি যুদ্ধ করার জন্যে প্রশিক্ষণ নেবার সময় পর্যন্ত ছিল না। খালেদ মোশাররফের ভাষায়, যুদ্ধক্ষেত্রেই তাদের প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল। তাদের বুকের ভেতরে ছিল সীমাহীন সাহস আর মাতৃভূমির জন্যে গভীর মমতা। বাংলাদেশের নিয়মিত বাহিনী যখন প্রচলিত পদ্ধতিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছে, তখন এই গেরিলাবাহিনী দেশের ভেতরে থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। তাদেরকে বাধ্য করেছে তাদের গতিবিধি নিজেদের ঘাঁটির মাঝে সীমাবদ্ধ রাখতে।

এই মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা বলে কখনো শেষ করা যাবে না। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসারের নিজেদের লেখা বইয়ে একটি ছোট কাহিনি এরকম: ১৯৭১ সালের জুন মাসে রাজশাহীর রোহনপুর এলাকায় একজন মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে। শত অত্যাচারেও সে মুখ খুলছে

না। তখন পাকিস্তানি মেজর তাঁর বুকে স্টেনগান ধরে বলল, আমাদের প্রশ্নের উত্তর দাও, তা না হলে তোমাকে আমি গুলি করে মেরে ফেলব। নির্ভীক সেই তরুণ মুক্তিযোদ্ধা নিচু হয়ে মাতৃভূমির মাটিতে শেষবারের মতো চুমু খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। আমার রক্ত আমার প্রিয় দেশটাকে স্বাধীন করবে। এই হচ্ছে দেশপ্রেম, এই হচ্ছে বীরত্ব এবং এই হচ্ছে সাহস। এঁদের দেখেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী জানত এই দেশটিকে তারা কখনোই পরাজিত করতে পারবে না, আগে হোক পরে হোক, পরাজয় স্বীকার করে তাদের এই দেশ ছেড়ে যেতেই হবে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেনি, কিন্তু প্রকৃত যোদ্ধাদের মতোই অবদান রেখেছিল, সেরকম প্রতিষ্ঠানটির নাম হচ্ছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। আমাদের কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাহায্যে এই বেতার কেন্দ্র বাংলাদেশের অবরুদ্ধ জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস আর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। সেই সময়ের অনেক দেশের গান এখনো বাংলাদেশের মানুষকে উজ্জীবিত করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদানের কথা আলাদা করে না বললে ইতিহাসটি অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। তাঁদের সাহায্য সহযোগিতার জন্যই মুক্তিযোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে যুদ্ধ করতে পেরেছেন। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, যুদ্ধাহতদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন, এমনকি অস্ত্র হাতে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরোচিত ভূমিকা রেখেছেন।

দেশদ্রোহীর দল:

বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোনো বন্ধু ছিল না, তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল কিছু দেশদ্রোহী। বাংলাদেশের মানুষ এদের সবাইকে নির্বাচনে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেই দেশদ্রোহী মানুষগুলো ছিল কাউন্সিল মুসলিম লীগের খাজা খয়েরউদ্দিন, কনভেনশন মুসলিম লীগের ফজলুল কাদের চৌধুরী, কাইয়ূম মুসলিম লীগের খান এ সবুর খান, জামায়াতে ইসলামীর গোলাম আযম এবং নেজামে ইসলামীর মৌলভী ফরিদ আহমেদ। এদের মাঝে জামায়াতে ইসলামী নামের রাজনৈতিক দলটির কথা আলাদা করে বলতে হয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্যে দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদের নিয়ে রাজাকারবাহিনী তৈরি করা হয়েছিল সেটি ছিল মূলত জামায়াতে ইসলামীরই সশস্ত্র একটি দল। সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি রাজনৈতিক প্রতিনিধি দল জেনারেল নিয়াজীর কাছে এটা নিয়ে অভিযোগ করলে জেনারেল নিয়াজী তার অধস্তন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয় তখন থেকে রাজাকারদের আলবদর এবং আলশামস বলে ডাকতে! এই রাজাকার কিংবা আলবদর ও আলশামসের মুক্তিযোদ্ধাদের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা বা সাহস কোনোটাই ছিল না, কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পদলেহী হিসেবে থেকে এরা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ওপর যে অত্যাচার এবং নির্যাতন করেছে তার অন্য কোনো নজির নেই। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই দেশের মানুষকে চিনত না- আলবদর, আলশামস প্রকৃত অর্থ যাই হোক না কেন, বাংলাদেশের মানুষের কাছে এর চাইতে ঘৃণিত কোনো শব্দ নেই, কখনো ছিল না কখনো থাকবে না।

দেশের বাইরে মুক্তিযুদ্ধ:

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় প্রবাসী অনেক বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছেন। তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা এবং বাংলাদেশ সরকারের জন্যে টাকা তুলেছেন, পাকিস্তানের গণহত্যার কথা পৃথিবীকে জানিয়েছেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে জনমত তৈরি করেছেন। যাঁদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, তাঁরা হচ্ছেন জাস্টিস আবু সায়ীদ চৌধুরী, স্থপতি এফ.আর. খান, প্রফেসর মুহম্মদ ইউনুস এবং প্রফেসর রেহমান সোবহান। শুধু যে বাংলাদেশের মানুষই এগিয়ে এসেছিলেন তা নয়, আগস্টের ১ তারিখ নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ারে রবিশংকর, জর্জ হ্যারিসন সহ অসংখ্য শিল্পীকে নিয়ে স্মরণাতীত কালের বৃহত্তম একটি কনসার্ট সারা পৃথিবীর বিবেককে নাড়িয়ে দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কবি অ্যালেন গিনসবার্গ শরণার্থীদের কষ্ট নিয়ে সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' নামে যে অসাধারণ কবিতাটি রচনা করেন, সেটি এখনো মানুষের বুকে শিহরণের সৃষ্টি করে।

পক্ষের দেশ বিপক্ষের দেশ:

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যার কথা পৃথিবীতে প্রচার হওয়ার পর পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেরই সমবেদনা বাংলাদেশের পক্ষে ছিল, তবে দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ

দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন পাকিস্তানের পক্ষে থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। একাত্তরে যদিও ইসলামের নামে বাংলাদেশের বেশিরভাগ মুসলমানকেই হত্যা করা হচ্ছিল, তার পরেও পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিম দেশও পাকিস্তানের পক্ষে থেকে আমাদের মুক্তিসংগ্রামের বিরোধিতা করেছে। যদিও রাজনৈতিক কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানের পক্ষে ছিল, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যার দৃশ্য দেখে সে সময়কার মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্চার কে.রুড ক্ষুব্ধ হয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্টে যে টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছিলেন সেটি কূটনৈতিক জগতে সবচেয়ে কঠিন ভাষায় লেখা চিঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামের একেবারে শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সপ্তম নৌবহরের যুদ্ধজাহাজ বঙ্গোপসাগরে পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নও নিউক্লিয়ার ক্ষমতাধারী যুদ্ধজাহাজ এই এলাকায় রওনা করিয়ে দিয়েছিল। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটি সত্যি যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে উপলক্ষ্য করে বিশ্বের দুই পরাশক্তি নিউক্লিয়ার অস্ত্র নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল।

স্বাধীনতা যুদ্ধের একেবারে শেষ মুহূর্তে যখন বাংলাদেশ এবং ভারতের যৌথবাহিনীর জয় একেবারে সুনিশ্চিত তখন সেই বিজয়ের মুহূর্তটিকে থামিয়ে দেবার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বারবার জাতিসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দিয়ে এ প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়ে আমাদের বিজয়ের পথ সুনিশ্চিত করেছিল। তবে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে দেশটির ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি, সেই দেশ হচ্ছে ভারত। এই দেশটি প্রায় এক কোটি শরণার্থীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছিল, আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র, প্রশিক্ষণ আর আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছিল। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার পর ভারত মুক্তিবাহিনীর সাথে মিত্রবাহিনী হিসেবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেয়। এই যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রায় দেড়হাজার সৈনিক প্রাণ দিয়েছিল।

যৌথবাহিনীঃ

জুলাই মাসের দিকে নতুন করে যুদ্ধ শুরু করে অক্টোবর মাসের ভেতর বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী দেখতে দেখতে শক্তিশালী আর আত্মবিশ্বাসী হয়ে

উঠেছিল। তাঁরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্ডার আউটপোস্টগুলো নিয়মিতভাবে আক্রমণ করে দখল করে নিতে শুরু করে। গেরিলাবাহিনীর আক্রমণও অনেক বেশি দুঃসাহসী হয়ে উঠতে থাকে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই আক্রমণের জবাব দিত রাজাকারদের নিয়ে গ্রামের মানুষের বাড়িঘর পুড়িয়ে আর স্থানীয় মানুষদের হত্যা করে। ততদিনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়তে শুরু করেছে, তারা আর সহজে তাদের ঘাঁটির বাইরে যেতে চাইত না।

বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবস্থা দেখতে দেখতে এত খারাপ হয়ে গেল যে পাকিস্তান তার সমাধান খুঁজে না পেয়ে ডিসেম্বরে তিন তারিখ ভারত আক্রমণ করে বসে। পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ছিল হঠাৎ আক্রমণ করে ভারতের বিমানবাহিনীকে পুরোপুরি পঙ্গু করে দেবে, কিন্তু সেটি করতে পারল না। ভারত সাথে সাথে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সাথে যৌথভাবে বাংলাদেশে তার সেনাবাহিনী নিয়ে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের ভেতর তখন পাকিস্তানের পাঁচটি পদাতিক ডিভিশন। যুদ্ধের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আক্রমণের জন্য তিনগুণ বেশি অর্থাৎ ১৫ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ভারতীয়রা মাত্র আট ডিভিশন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ শুরু করার সাহস পেয়েছিল। কারণ তাদের সাথে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের বাহিনী। সেই মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে এর মাঝেই পুরোপুরি অচল করে রাখতে পেরেছিল। শুধু যে মুক্তিযোদ্ধারা ছিল তা নয় এই যুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষও ছিল যৌথবাহিনীর সাথে। যুদ্ধ শুরু হবার পর সেটি চলেছে মাত্র তেরো দিন। একেবারে প্রথম দিকেই বোমা মেরে এয়ারপোর্টগুলো অচল করে দেবার পর পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের সব পাইলট পালিয়ে গেল পাকিস্তানে। সমুদ্রে যে কয়টি পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজ ছিল সেগুলো ডুবিয়ে দেবার পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাকি রইল শুধু তার স্থলবাহিনী। নিরীহ জনসাধারণ হত্যা করতে তারা অসাধারণ পারদর্শী কিন্তু সত্যিকার যুদ্ধ কেমন করে, সেটি দেখার জন্যে মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় বাহিনী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর একটি একটি করে পাকিস্তানের ঘাঁটির পতন হতে থাকল। তারা কোনোমতে প্রাণ নিয়ে অল্পকিছু জায়গায় মাটি কামড়ে পড়ে রইল। ভারতীয় বাহিনী আর মুক্তিবাহিনী তাদেরকে পাশ কাটিয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ঢাকার কাছাকাছি এসে হাজির হয়ে যায়। মেঘনা নদীতে কোনো ব্রিজ ছিল না,

সাধারণ মানুষ তাদের নৌকা দিয়ে সেনাবাহিনীকে তাদের ভারী অস্ত্রসহ পার করিয়ে আনল!

ঢাকায় জেনারেল নিয়াজী এবং তার জেনারেলরা বাংলাদেশের যুদ্ধে টিকে থাকার জন্যে যে দুটি বিষয়ের ওপর ভরসা করছিল, সেগুলো ছিল অত্যন্ত বিচিত্র। প্রথমত, তারা বিশ্বাস করত পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধে তারা ভারতকে এমনভাবে পর্যুদস্ত করবে যে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বাহিনীর সরে যাওয়া ছাড়া কোনো গতি থাকবে না। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধে তাদের সাহায্য করার জন্যে উত্তর দিক থেকে আসবে চীনা সৈন্য আর দক্ষিণ দিক থেকে আসবে আমেরিকান সৈন্য। কিন্তু দেখা গেল, তাদের দুটি ধারণাই ছিল পুরোপুরি ভুল। পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে পাকিস্তানিরাই চরমভাবে পর্যুদস্ত হলো আর কোনো চীনা বা আমেরিকান সৈন্য তাদের সাহায্যে জন্যে এগিয়ে এল না!

আত্মসমর্পণ:

মুক্তিযোদ্ধা আর ভারতীয় সৈন্যরা ঢাকা ঘেরাও করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করার জন্যে আহবান করল। গভর্নর হাউসে বোমা ফেলার কারণে তখন গভর্নর মালেক আর তার মন্ত্রীরা পদত্যাগ করে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমান শেরাটনে) আশ্রয় নিয়েছে। ভারতীয় বিমানবাহিনী ঢাকার সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ লিফলেট ফেলেছে, সেখানে লেখা' মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার আগে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করো।

ঢাকার 'পরম পরাক্রমশালী' পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তখন আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিল। আত্মসমর্পণের দলিলে বাংলাদেশ এবং ভারতের যৌথ নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করার কথাটি দেখে একজন পাকিস্তান জেনারেল দুর্বলভাবে একবার সেখান থেকে বাংলাদেশের নামটি সরানোর প্রস্তাব করেছিল কিন্তু কেউ তার কথাকে গুরুত্ব দিল না, ইতিহাসে সত্যকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই!

১৬ ডিসেম্বর বিকেল বেলা রেসকোর্স ময়দানে হাজার হাজার মানুষের সামনে জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি থেকে মাথা নিচু করে বিদায় নেয়ার দলিলে স্বাক্ষর করল। যে বিজয়ের জন্যে এই দেশের মানুষ সুদীর্ঘ নয় মাস অপেক্ষা করছিল সেই বিজয়টি এই দেশের স্বজন হারানো সাতকোটি মানুষের হাতে এসে ধরা দিল।

বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় পাকিস্তানের সব সৈন্য আত্মসমর্পণ করে শেষ করতে করতে ডিসেম্বরের ২২ তারিখ হয়ে গেল।

বিজয়ের আনন্দ দুঃখের হাহাকার

পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করার পর বিজয়ের অবিশ্বাস্য আনন্দ উপভোগ করার আগেই একটি ভয়ংকর তথ্য বাংলাদেশের সকলকে স্তম্ভিত করে দিল। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যখন সবাই বুঝে গেছে এই যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, সত্যি সত্যি বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে নিজের স্থান করে নিচ্ছে, তখন এই দেশের বিশ্বাসঘাতকের দল আলবদর বাহিনী দেশের প্রায় তিনশত শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানীকে ধরে নিয়ে যায়। তাঁদের উদ্ধার করার জন্যে দেশের মানুষ যখন পাগলের মতো হন্যে হয়ে খুঁজছে তখন তাদের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ রায়ের বাজার বধ্যভূমি এবং অন্যান্য জায়গায় খুঁজে পাওয়া যেতে থাকল। দেশটি যদি সত্যি সত্যি স্বাধীন হয়ে যায় তারপরেও যেন কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, সেই ব্যাপারটি এই বিশ্বাসঘাতকের দল নিশ্চিত করে যাওয়ার জন্য এই দেশের সোনার সন্তানদের ঠান্ডা মাথায় হত্যা করেছে।

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে জড়িত আলবদর বাহিনীতে ছিল জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য চৌধুরী মইনুদ্দিন, আশরাফুজ্জামান খান, মতিউর রহমান নিজামী (পূর্ব পাকিস্তান আলবদর সর্বাধিনায়ক) এবং আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ (পূর্ব পাকিস্তান আলবদর বাহিনীর কেন্দ্রীয় সংগঠক)।

আমাদের অহংকার:

আমাদের মাতৃভূমির যে মাটিতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, ওপরে তাকালে যে আকাশ আমরা দেখতে পাই কিংবা নিঃশ্বাসে যে বাতাস আমরা বুকের ভেতর টেনে নেই, তার সবকিছুর জন্যেই আমরা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ঋণী। সেই ঋণ বাঙালি জাতি কখনোই শোধ করতে পারবে না, বাঙালি কেবল তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতাটুকু প্রকাশ করার একটুখানি সুযোগ পেয়েছে তাঁদেরকে

বীরত্বসূচক পদক দিয়ে সম্মানিত করে। পুরস্কার প্রাপ্তদের মাঝে সাতজন হচ্ছেন মরণোত্তরে সবচেয়ে বড় পদকপ্রাপ্ত বীরশ্রেষ্ঠ। তাঁরা হচ্ছেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, হামিদুর রহমান, মোস্তফা কামাল, রুহুল আমীন, মতিউর রহমান, মুন্সী আব্দুর রউফ এবং নূর মোহাম্মদ শেখ। এঁদের মাঝে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ ছিল পাকিস্তানে এবং বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের দেহাবশেষ ছিল ভারতে। তাঁদের দুজনের দেহাবশেষই এখন বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। অন্য বীরশ্রেষ্ঠ এবং অসংখ্য শহিদ মুক্তিযোদ্ধার সাথে সাথে তাঁদের দুজনকেও এখন গভীর মমতায় আলিঙ্গন করে আছে আমাদের মাতৃভূমির মাটি।

১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বসূচক অবদান রাখার জন্যে যাঁদের বীরত্বসূচক পদক দেয়া হয়, তাঁদের মাঝে নারী মুক্তিযোদ্ধাও আছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই দেশের নারীরা শুধু যে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন, সাহায্য সহায়তা করেছেন তা নয়, অস্ত্র হাতে পুরুষদের পাশাপাশি তাঁরা যুদ্ধও করেছেন।

যুদ্ধের গ্লানিঃ

যে-কোনো যুদ্ধই হচ্ছে মানবতার বিরুদ্ধে এক ধরনের নিষ্ঠুরতা। যুদ্ধের সাথে কোনোভাবে সম্পর্ক না থাকার পরও যুদ্ধের সময় অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়। আমাদের দেশেও সে ধরনের ঘটনা ঘটেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে বসবাসকারী বিহারিরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষে থেকে এক ধরনের অমানুষিক নৃশংসতায় বাঙালিদের নির্যাতন নিপীড়ন আর হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল। তাদের নৃশংসতার জবাবে মুক্তিযুদ্ধের আগে, পরে এবং চলাকালে অনেক বিহারিকে হত্যা করা হয়, যার ভেতরে অনেকেই ছিল নারী, শিশু কিংবা নিরপরাধ। বিহারিদের প্রায় সবাই পাকিস্তানে ফেরত যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেও পাকিস্তান সরকার তাদের নিজের দেশে নিতে আগ্রহী নয় বলে এই হতভাগ্য সম্প্রদায় দীর্ঘদিন থেকে জেনেভা ক্যাম্পে মানবেতর জীবনযাপন করে আসছে।

গণহত্যার পরিসংখ্যানঃ

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্য

সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০ হাজার, মিলিশিয়া বাহিনী ছিল আরো ২৫ হাজার, বেসামরিক বাহিনী প্রায় ২৫ হাজার, রাজাকার, আলবদর, আলশামস আরো ৫০ হাজার। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ পচাঁত্তর হাজার। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ভারতীয় সেনা মিত্রবাহিনী হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগ দেয়। যুদ্ধ শেষে আত্মসমর্পণের পর প্রায় একানব্বই হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি ভারতে স্থানান্তর করা হয়।

যুদ্ধ চলাকালে প্রায় আড়াই লক্ষ নারী পাকিস্তান সেনাবাহিনী আর তাদের পদলেহী বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীদের নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। যুদ্ধের সময় প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি, এই এক কোটি মানুষ দেশত্যাগ না করলে তাদের প্রত্যেককেই হয়ত এই দেশে হত্যা করা হতো।

মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যা চলাকলে কতজন মানুষ মারা গিয়েছে সে সম্পর্কে গণমাধ্যমে বেশ কয়েক ধরনের সংখ্যা রয়েছে। ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড আলমানাকে সংখ্যাটি ১০লক্ষ, নিউইয়র্ক টাইমস (২২ ডিসেম্বর ১৭৭২) অনুযায়ী ৫ থেকে ১৫ লক্ষ, কম্পটনস এনসাইক্লোপিডিয়া এবং এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা অনুযায়ী সংখ্যাটি ৩০ লক্ষ। প্রকৃত সংখ্যাটি কত, সেটি সম্ভবত কখনোই জানা যাবে না। তবে বাংলাদেশের এই সংখ্যাটি ৩০ লক্ষ বলে অনুমান করা হয়।

স্বাধীনতার পরঃ

বাংলাদেশে যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছিল তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে আটক, জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল এবং হত্যা করার পর তাঁর মৃতদেহ সমাহিত করার জন্যে জেলখানায় তাঁর জন্যে একটি কবরও খোঁড়া হয়েছিল। বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরাজিত হবার পর বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়া হয় এবং তিনি ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশে ফিরে আসেন এবং ১৫ মার্চের ভেতর বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী নিজ দেশে ফিরে যায়।

বিজয়ের আনন্দ এবং বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তনের পর দেশের মানুষের ভেতর ভবিষ্যৎ

নিয়ে যে স্বপ্নের জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশের নতুন সরকারের জন্যে সেটি পূরণ করা ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠতে থাকে। যারা সরকার চালানোর দায়িত্ব নিয়েছে তাদের কারো সরকার চালানোর অভিজ্ঞতা নেই। পাকিস্তান সেনাবাহিনী যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে রাস্তাঘাট কলকারখানা সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে, দেশের অর্থনীতি পুরোপুরি বিধ্বস্ত। রাজনীতিতেও ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় যিনি দেশ পরিচালনা করেছেন সেই তাজউদ্দিন আহমেদের সাথে বঙ্গবন্ধুর একটি দূরত্ব তৈরি হয়ে গেল। শুধু দেশের ভেতর থেকে নয় দেশের বাইরেও ষড়যন্ত্র শুরু হলো, দেশে যখন খাদ্যের ঘাটতি তখন চাল বোঝাই জাহাজ হঠাৎ করে বাংলাদেশে না এসে অন্যদিকে চলে গেল। মানুষের ক্ষুধা দেশে দুর্ভিক্ষ। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, সেই বিশৃঙ্খলা দমন করার চেষ্টা করছে রক্ষীবাহিনী। সব মিলিয়ে যখন দেশে একটি অরাজক পরিস্থিতি, আওয়ামী লীগ সরকার তখন 'বাকশাল' তৈরি করে একদলীয় শাসন চালু করার চেষ্টা করল যে কাজটি স্বাধীনতার পরেই গ্রহণযোগ্য একটি বিষয় ছিল, চার বছর পর সেটি কারো কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হলো না। চারিদিকে অসন্তোষ, ক্ষোভ। দেশের এরকম দুঃসময়ের একটি সুযোগ নিয়ে সেনাবাহিনীর কিছু তরুণ অফিসার বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে খুন করে ফেলল, নববিবাহিতা বধূ কিংবা শিশু সন্তানটিও সেই নিষ্ঠুরতা থেকে রেহাই পেল না। এখানেই শেষ নয়, আওয়ামী লীগের সবচেয়ে প্রবীণ চারজন নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, এম মনসুর আলী এবং এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামানকে জেলখানায় আটকে রেখে তাঁদের সেখানেই হত্যা করা হলো। যেন এটি সভ্য জগৎ নয়- যেন এটি বর্বর মানুষের দেশ।

শুরু হলো অন্ধকার জগৎ। বঙ্গবন্ধুর সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দেশদ্রোহীদের একটি অংশকে ক্ষমা করেছিলেন কিন্তু যারা সত্যিকার যুদ্ধাপরাধী, যারা খুন, জখম, হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের মতো ভয়ংকর অপরাধ করেছিল তাদের কাউকে ক্ষমা করা হয়নি। এরকম ১১ হাজার যুদ্ধাপরাধীকে বিচারের জন্যে আটক রাখা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর বিচারপতি আবু সাদাত মোঃ সায়েম এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানের সরকার তাদের ক্ষমা করে দিল। যুদ্ধাপরাধীরা ছাড়া পেয়ে গেলে তাদের পুনর্বাসিত করতে থাকে পরবর্তী সামরিক সরকার আর স্বৈরশাসকেরা।

১৯৭২ সালে যে অপূর্ব সংবিধান রচিত হয়েছিল, সেটিতে একটির পর একটি পরিবর্তন এনে ধর্মনিরপেক্ষতার মতো রাষ্ট্রের মূল আদর্শে হাত দেয়া শুরু হলো। ধর্মান্ধতা আর সাম্প্রদায়িকতা স্থান করে নিতে থাকল সরকারের ভেতর, সমাজের ভেতর।

শেষ কথা:

আমাদের দুঃখী দেশটি আমাদের বড় ভালোবাসার দেশ, বড় মমতার দেশ। যাঁরা জীবন বাজি রেখে এই স্বাধীন দেশটি আমাদের এনে দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞাতার শেষ নেই। আর যেসব স্বাধীনতা বিরোধী, বিশ্বাসঘাতক, যুদ্ধাপরাধী এই স্বাধীন রাষ্ট্রটিকে গলা টিপে হত্যা করার চেষ্টা করছে তাদের জন্যে রয়েছে অন্তহীন ঘৃণা। আজ থেকে একশ বছর কিংবা হাজার বছর পরেও যতদিন বাংলাদেশ টিকে থাকবে, এই দেশের মানুষ স্বাধীনতা বিরোধী, বিশ্বাসঘাতক, যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করবে না।

আমরা স্বপ্ন দেখি আমাদের নতুন প্রজন্ম মাতৃভূমিকে ঘুরে ঘুরে অভিমানী মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে বের করে তাদের হাত স্পর্শ করে বলবে, আমাদের একটি স্বাধীন দেশ দেয়ার জন্যে ভালোবাসা এবং ভালোবাসা। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের চোখের দিকে তাকিয়ে কোমল গলায় বলবে, আমরা তোমাদের কথা দিচ্ছি, তোমরা যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলে আমরা সেই বাংলাদেশকে গড়ে তুলব। তোমাদের রক্তের ঋণ আমরা শোধ করব।

বীর মুক্তিযোদ্ধা
এ.বি.এম. রুহুল আমিন হাওলাদার
কো-চেয়ারম্যান, জাতীয় পার্টি

থাকবো না চলে যাব কিন্তু আমাদের নতুন প্রজন্ম যারা মুক্তিযুদ্ধের পতাকা বহন করবে তারা যেন আদর্শ নাগরিক হয়, সুশিক্ষিত হয় এবং তাদের দেশপ্রেম যেন অসাধারণ ও অনন্য হয়। কারণ তারা মুক্তযোদ্ধাদের সন্তান। তারা যেন অন্য মানুষের সন্তানদের থেকে মাথা উঁচু করে চলতে পারে এই সমাজ ব্যবস্থায়। সেই চরিত্র নিয়ে তাদেরকে বলিয়ান হতে হবে। হয়তো তাদের চলার পথে কিছু প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হবে, বা হয়েছে, হচ্ছে, তার পরেও তাঁদেরকে মনে রাখতে হবে তারা মুক্তযোদ্ধার সন্তান, যুগ যুগ ধরে যেন মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে মানুষ সম্মান করে, সেই ভাবে নিজেদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, মানুষের কাছে সমাদৃত হতে হবে, সাধারণ মানুষ যেন বলে একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান দেখো সে কত মহান, কত সৎ, কত ত্যাগী, সাধারণ মানুষের জন্য কত ভালোবাসা তার হৃদয়ে, সাধারণ মানুষ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের চরিত্র হবে ব্যতিক্রম। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা যদি নিজেদের কে আলাদাভাবে দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তোলে, নিজেকে পিতার মতো সৎ ও আদর্শবান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে এই সমাজ ব্যবস্থায়, দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে, এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়াতে পারে সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে, আমাদের ত্যাগ ও আদর্শের স্মৃতি বহমান রাখে তাহলেই আমাদের ত্যাগ আর আদর্শ প্রতিষ্ঠা হবে সাধারণ মানুষের মাঝে। তাহলে আমরা তোমাদের কর্মের মাঝে বেঁচে থাকব, তোমরাই আমাদের পতাকা বহন করবে। আমরা যা চেয়েছিলাম বাংলার মানুষের মাঝে হাসি ফোটাবো বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ব, মানুষ সুখে থাকবে, নিরাপদে

থাকবে, একটি আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে উঠবে, পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশের পতাকা উড়বে মানুষ তাকিয়ে বলবে বাংলাদেশের মানুষ অনেক ভালো, বাংলাদেশ আজ তাদের সমাজ ছাড়িয়ে পৃথিবীর বুকে মাথা উচু করে চলছে, এটাই আমি আশা করি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের কাছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম. রুহুল আমিন হাওলাদার, তার
যুদ্ধকালীন ক্যাম্প কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমান বাচ্চু

আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা, আমি রণক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছি, বেঁচে থাকার কথা ছিল না, আমার সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম এ জলিল, তার সাথে আমি ২৯ শে ডিসেম্বর যশোর এর কাছাকাছি ঢাকায় আসার পথে বন্দি হতে হয়েছিল, সেদিনটাকে আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে, মেজর জলিল সাহেবের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনে সরাসরি ছিলাম, কিন্তু তার পরেও স্বাধীন দেশে বাড়িতে ফিরে আসার পথে এই ধরনের একটা দুর্ঘটনা আমাদের রাজনৈতিক জীবনে এটা স্মরণ করিয়ে দেয় যে রাজনীতি কতটা নির্মম। যাইহোক আমি আশা করি এরকম ঘটনা আর কারো জীবনে যেন না ঘটে, আমরা যারা মুক্তিযোদ্ধারা বেঁচে আছি আমাদের সকলেরই সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে, আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করি।

আমার পরিচয়, আমি এ.বি.এম রুহুল আমিন হাওলাদার, আমি যুদ্ধ করেছি ৯ নম্বর সেক্টরে খুলনা ও খুলনার আশেপাশে, যশোরে, মংলা। আমরা যুদ্ধ শেষে

বাড়িতে ফিরে আসি, এরপরে আবার লেখাপড়া শুরু করি, আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলাম, আমি ১৯৭৯ সালে মুক্তিযোদ্ধা কোটা থেকে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি, পরবর্তীকালে আমি ১৯৮১ সালে উপমন্ত্রীর হিসেবে জুট ও টেক্সটাইল এর দায়িত্বে ছিলাম।

পরে এরশাদ সাহেব যখন দল গঠন করেন আমাকে আহ্বান করেন তিনি, তার সাথে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল, তিনি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন, আমি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলে ছিলাম, তখন আমি ঢাকা মহানগরের দায়িত্বে ছিলাম, তেজগাঁও দায়িত্বে ছিলাম, ওইখান থেকেই এরশাদ সাহেব আমাকে মনোনীত করেন এবং আমি নির্বাচিত হয়ে আসি। এরপরে এরশাদ সাহেব যখন দল করেন তখন আমি তার দলে যোগদান করি, তিনি আমাকে বলেছিলেন, তুমি আমার সাথে থাকো।

যখন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ করতাম উনি তখন প্রধান পৃষ্ঠপোষক, আমার বহু সভায় তিনি গিয়েছেন তিনি খুব ভালো বাংলা বলতেন। তিনি কাছে নিয়ে আদর ও স্নেহ করতেন আমাদেরকে, তার মমত্ববোধ দিয়ে আমাদেরকে বহু দূরে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। স্বাধীনতার পরে যারা বেকার মুক্তিযাদ্ধা ছিলেন, যাদের পারিবারিক অনেক সমস্যা ছিল, তাদের দিকে তিনি তাকিয়ে ছিলেন, বিশেষ করে আমি একথা অবশ্যই বলব, ইতিহাসে একদিন লিখবে, তিনি বলেছিলেন মুক্তিযোদ্ধা

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সন্তান, মুক্তিযোদ্ধাদের এতোটুকু সম্মান দেওয়ায় তার ডাকে আমার সাড়া দেওয়া কর্তব্য ছিল। তাই আমি তার দলে যোগ দিয়েছিলাম।

সংসদ সদস্য হয়েছিলাম তার দল থেকে। প্রতিমন্ত্রী ছিলাম, মন্ত্রী ছিলাম, তার উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য থেকে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলাম, এবং তার দলের মহাসচিব হিসেবে আমি ১৮ বছর দায়িত্ব পালন করেছি। আজকে আমি জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান। এই দলের ঊষালগ্ন থেকেই আমি দলে আছি এবং সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আমি এই দল করে যাচ্ছি। দেশের মানুষের যে ভালোবাসা এবং সমর্থন আমি পেয়েছি তার জন্য আমি এই দেশের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি হয়তো অনেক কিছু দিতে পারি নাই আমার ক্ষুদ্র অবস্থা থেকে, কিন্তু আমি মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি, মানুষের দোয়া পেয়েছি, মানুষের সমর্থন পেয়েছি এবং মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসার যে একটা উচ্ছ্বাস সমাজ ব্যবস্থায় থাকে তাও আমি পেয়েছি আমি বুঝতে পারি যে মানুষ আমাকে ভালোবাসে। আমি সেই ভাবে চলার চেষ্টা করেছি। যে মুক্তিযোদ্ধা হবেন একজন সমাজের আদর্শ, সমাজের বিবেক, সেই অবস্থানে থেকেই আমি নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি, আমি দেশের মানুষের সহযোগিতায় এবং তাদের দোয়ায় আল্লাহর অশেষ রহমতে অনেক সম্মান নিয়ে বেঁচে আছি।

১৯৭১ সালে দেশের একটি ক্লান্তিলগ্নে, বঙ্গবন্ধু তখন কারাগারে, ২৬ শে মার্চ

অর্থাৎ ২৫ শে মার্চ দিবাগত রাত্রে পাক-হানাদার বাহিনী আমাদের বাঙালি জাতির ঠিকানা আমাদের দেশের ক্যাপিটাল ঢাকা, সেই ঢাকার উপরে অতর্কিতভাবে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো, যেখানে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ থাকেন, বুদ্ধিজীবীরা থাকেন, ছাত্রজনতা শ্রমিক যেখানে সবথেকে বেশি বসবাস করেন এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় তারা গভীর রাতে অপারেশন সার্চলাইট নামে হত্যাযজ্ঞ চালালো, রাজারবাগের বাঙালি পুলিশদের হত্যা করল। রোকেয়া হল, শামসুন্নাহার হলে আক্রমণ করে হত্যা যজ্ঞ চালালো, যখন যেভাবে মানুষগুলো পেয়েছে তখন তাদেরকে গণহত্যা করল নির্বিচারে।

পরের দিন দেশের মানুষের ভিতরে একটা অনিশ্চয়তা দেখা দিল, অস্বাভাবিক পরিস্থিতি দেখা দিল, আমরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আন্দোলনে ছিলাম, সংগ্রামে ছিলাম, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা আন্দোলন-সংগ্রাম করছিলাম তাই সেই ২৫ মার্চ রাতে তাকেও ওরা এরেস্ট করলো।

আমরা ছাত্র-জনতা যে যেখানে আশ্রয় নিতে পারি সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিলাম তারপর আমরা অনুসরণ করলাম বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। "তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করো, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" এই কথাগুলো আমাদের হৃদয়ে গোচ্ছিত ছিল, আমরা অনেক সাহস নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম, এরপর শুরু হলো ঢাকার বাহিরে অপারেশন, আমি তখন বরিশালে, আমরা দেখলাম এপ্রিল মাসে, সম্ভবত ২৩শে

এপ্রিল শুক্রবার বরিশাল আক্রমণ করল, হানাদার বাহিনী বরিশাল দখল করল, সেখানে কিছু কিছু জায়গায় আমাদের সাথে গোলাগুলি হলো, আমাদের ছাত্রবন্ধুরা এবং পুলিশের লোক এরা ঘুরে দাঁড়ালো কিন্তু ওদের সশস্ত্র আক্রমণ আমাদের পিছু হটতে বাধ্য করলো। তারপর ২৫ এপ্রিল তারিখে তারা পটুয়াখালী দখল করল। হেলিকপ্টারে করে সেখানে সৈন্য নামালো, অনেক লোককে মেরে ফেলল এবং অফিস-আদালত দখল করল। এরপর কিছু দিন কাটলো আমরা সবাই মিলে কিভাবে এই শত্রুর মোকাবেলা করবো এই ভেবে আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকলাম, এবং আমাদের কাছে কিছু অস্ত্র ছিল। আমাদের আমাদের সিনিয়র যারা সহকর্মী এবং পুলিশ বাহিনী (ইপিআর) থেকে যারা চলে আসলো এবং যারা সেনাবাহিনীতে ছিল তারা গ্রামে চলে এসে গ্রামের যুবক এবং উল্লেখযোগ্য লোকদেরকে নিয়ে ২০০ লোক কে তারা একত্রিত করল এবং দশটা রাইফেল দিয়ে ট্রেনিং দেয়া শুরু করল। এর মধ্যে আমাদের কলসকাঠি, বাকেরগঞ্জে বারোটা জমিদার পরিবার ছিল, সেইখানে হিন্দুদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করল, ভোর রাত্রে গানবোট নিয়ে ঘেরাও করে ফেলল, একই দিনে প্রায় তিনশো লোককে ওরা নির্মমভাবে হত্যা করলো, কলসকাঠির পাশ দিয়ে একটা ছোট্ট নদী তার পানি রক্তে লাল হয়ে গেল, এবং প্রত্যেকটা লাশ নদীতে ফেলে দিল, নদীর পাড়েই আমাদের বাড়ি, অদূরেই পায়রা নদী, রাতে আমরা গোলাগুলি শুনলাম এবং সকালে দেখলাম মৃত দেহগুলো নদীতে ভেসে যাচ্ছে।

আমরা তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা আমাদের জীবন বাজি রেখে এই মাতৃভূমিকে রক্ষা করবো, মুক্ত করবো আমাদের দেশ, তখন আমরা ছোটাছুটি শুরু করলাম কোথায় অস্ত্র আছে, কোথায় আমরা একত্রিত হব, এইভাবে আমাদের ইউনিয়নে, আমাদের উপজেলায়, সমস্ত জায়গায় বঙ্গবন্ধুর কথামতো গ্রামে গ্রামে সমস্ত জায়গায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করে সংগঠিত হতে লাগলাম। এরপরে আমি শুনলাম আমার দুই ভাই যারা আওয়ামী লীগ করত, তাদেরকে ধরে নিয়ে হত্যা করেছে, তাদের ডেড বডিও পাওয়া যায়নি, সেখানে যে যাব, সে পরিবেশও নেই, এবার আমরা বাড়ি থেকে বের হলাম,

বের হয়ে বাকেরগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ থেকে দবদবিয়া নামক একটি জায়গায় রাত্রিযাপন করলাম, সেখান থেকে আমরা গেলাম বাবুগঞ্জ, বাবুগঞ্জে এসে একটা যুদ্ধ হয়ে গেল, আমাদের ছাত্র যুবক ভাইয়েরা এবং সেনাবাহিনীর কিছু লোকের নেতৃত্বে থানা লুট করে দখল করে নিলাম, মজিদ খান , কুদ্দুস মোল্লা সহ আরো কয়েকজন সাহসী লোক ছিল। আমরা ওখানে রাত্রে একত্রিত হয়ে দেখলাম যে এখানে যে পরিমাণ অস্ত্র আছে, তাতে আমরা সকলে যারা ছাত্র বা যুবক আছি, তাদের হাতে অস্ত্র পৌঁছাতে দেরি হবে, আমরা এখনো ট্রেনিং নিতে পারি নাই তাই ট্রেনিং নেবার জন্য আমরা আস্তে আস্তে ভারতের পথে রওনা হলাম। উজিরপুরে পয়সারহাট নামক একটা জায়গা আছে সেখান হয়ে আমরা মধুমতি নদী দিয়ে গোপালগঞ্জ হয়ে মাগুরা ও যশোরের মাঝে আড়পাড়া ব্রিজের নিচ দিয়ে, অনেক কষ্ট করে পার হলাম। উপরে রাজাকার ও মিলিশিয়া পুলিশ ডিউটি করে, তারা দেখামাত্র গুলি করে যুবকদের, তখন মে মাস হবে হয়তো, বৃষ্টি এসে গেছে। আমরা যখন পার হয়ে যাচ্ছি তখন গুলি হলো। আমাদের সাথের অনেকগুলো লোক মারা পড়লো। তারপরও আস্থা হারাইনি, বাড়িতে ফেরার আর কোনো সুযোগ নাই। আমরা অনেক দূরে এগিয়ে এসেছি। বিভিন্ন জায়গায় পাক হানাদার বাহিনী তারা পজিশন নিয়ে আছে। আমরা সামনে যাবো, মৃত্যু হলে রাস্তায় হয়ে যাক, কিন্তু ভারতে যাব ট্রেনিং নেবো। তারপর রাতে আমরা কালীগঞ্জ থানা অতিক্রম করলাম। ওখানে বাগদা বর্ডার নাম করে একটা জায়গা আছে সেখানে ফায়ার হলো। আমাদের, ভারতের সৈনিকেরা তারাও অস্ত্র নিয়েছিলো। এবং মেজর জলিল ঐ অঞ্চলের মধ্যে পড়লো। যশোরের কিছু অংশ পড়েছিলো খুলনায়, ওইখানে তারা মটার দিয়ে ফায়ার করলো। দুই পাশেই গোলাগুলি হচ্ছে কিন্তু আমরা নিচ দিয়ে নৌকায় পার হয়ে বাগদা বর্ডার অতিক্রম করলাম। ওখানে বনগাঁয়ে একটা জায়গা আছে, সাব ডিভিশন হয়ে, সেখানে যাওয়ার পরে সেখানে আমাদের ইউথ রিসিভিং ক্যাম্প ভারতের, সেখানে গিয়ে আমরা রের্কড করলাম সেখানে আমাদের মন্নান সাব ছিলো, তিনি আমাদের আপনজন। তার বাড়ির কাছেই আমার বাড়ি। ৭০ সনের নির্বাচনে আমরা তার ভোট করেছি।

ওই যে আমরা তার ভোট করেছি, এটা তার মনে আছে। সে তখন এমপি। সে থিয়েটার রোডে ক্যালকাটায় অবস্থান করছেন। বাংলাদেশের কিছু অফিস মুক্তিযুদ্ধের জন্য ওখানে করা হয়েছিল। আমরা ওখানে গিয়ে আমাদের নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করলাম। বিশেষ করে মন্নান সাবের সাথে যখন দেখা হলো, আরো অনেক কথা কিভাবে দেখা হলো, অনেক ঝুঁকি ছিলো। যাওয়ার পরেই মন্নান সাব একটা চিঠি লিখে দিলো। পলতা ক্যাম্প, ওটা হলো বনগাঁয়ে। বনগাঁ থেকে অদূরেই, আমরা সেখানেই গেলাম। ঐ চিঠি অনুসারে ঐদিন রাতে ট্রেনিং হলো। পথেও আমরা কিছু দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলাম। যাহোক বেঁচে থাকাই ছিলো একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। আমরা যখন বিহার, আগে ছিল ঝাড়খান প্রদেশ, সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। ঐ ঝাড়খানই এখন ক্যান্টনমেন্ট। ওখানে যাওয়ার পরেই সন্ধ্যা হলো, ওখানে ৩১ টা তোপধ্বনি দিয়ে আমাদেরকে রিসিভ করলো। ওখানে আর্মির ট্রেন ছিলো ভিন্ন, সেই ট্রেনে করে আমাদের নিয়ে গেলো। রিসিভ করলো আর্মি, তখন আমরা বুঝলাম আমাদের সম্মান জানিয়েছে এবং আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে এইভাবে। ডিফেন্সের রুলস অনুসারে আমাদের তারা সেইভাবেই নিচ্ছে। তো সাহস ও আস্থা আরো বেড়ে গেলো। আমরা তারপরে ৬ নম্বর উইংয়ে গেলাম। সেখানে আমাদের ট্রেনিং শুরু হলো, জাহাজ কিভাবে উড়াতে হবে ফ্লোটিং মাইন দিয়ে, এক্সপ্লোসিভ দিয়ে ব্রীজ উড়িয়ে দেওয়া, শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা। ওখানে হায়ার ট্রেনিং হলো, তিন মাসের, সেই ট্রেনিং নিয়ে আমরা মেজর জলিল ছিলো বাগুন্ডিয়া ঐখানে আসলাম। আসার পরে, ওখান থেকে আমাদের অস্ত্র দিলো,সব দিয়ে দিলো। আমরা ভিতরে ঢুকলাম, রাস্তায় আমাদের কয়েক জায়গায় শত্রুর সাথে মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং আমরা সেখানে সফলতার সাথে সুন্দর বন এসে পৌছলাম। সুন্দরবনে ওখানে একটা বাজুয়া বাজার ছিলো, সেই বাজারে আমরা ক্যাম্প করলাম। ওখানে বঙ্গবন্ধুর একজন আত্মীয় ছিলো, সম্পর্কে চাচা। সে-ই আমাদের ইউনিটের নেতৃত্ব দিচ্ছিলো। বঙ্গবন্ধুর রক্তে জড়িত,আমাদের একটা আস্থা আসলো। তার নাম ছিলো শেখ ফরিদ, বঙ্গবন্ধুর মতোই চেহারা ছিলো,

গোফ, চুল সব কিছুই বঙ্গবন্ধুর মতো দেখতে। মনে হলো জুনিয়র বঙ্গবন্ধু, আমরা খুবই উৎসাহী। ক্যাম্পের কমান্ডার হিসেবে অফিসিয়াল দায়িত্বে ছিলেন মিজানুর রহমান বাচ্চু তার বাড়ি নারায়ণগঞ্জে ওখানে বসেই অপারেশন হলো অনেক। অপারেশনগুলো শেষ করে যখন খুব কাছাকাছি এসে গেলাম, আমরা খুলনার পথে এগোতে থাকলাম, এবং ফুল বাড়িয়াতে একটা জায়গা আছে স্বাধীনতার পরে দেখা গেছে ঐখানে গাছগুলো ঝাঝড়া হয়ে গেছে, ওদের গুলিতে। যাইহোক আমরা শহরে প্রবেশ করে গেলাম। এটা ইতিহাসের কথা, ঢাকা যখন মুক্ত হলো ১৬ ডিসেম্বর, ওরা আত্মসমর্পণ করলো কিন্তু খুলনা মুক্ত হতে ১৭, ১৮ তারিখ লাগলো। তারপর দুইদিন যুদ্ধ হলো, আমাদের অনেক গুলো বাহিনী আশেপাশে যে থানা গুলি ছিলো, সেখান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা এসে ঘিরে ফেললাম খুলনাকে। আমাদের যেখানে যে রেইঞ্জ দিয়েছে, ভাগ ভাগ করে দিয়েছে। এইখানে এই ইউনিট বা রেইঞ্জ থাকবে। আমাদের সাথে মিত্র বাহিনীও প্রবেশ করলো, ওরা যখন আত্মসমর্পণ করলো, তখন অনেক অস্ত্র গোলাবারুদ আমাদের আয়ত্বে আসলো। সেই অস্ত্রগুলো নিয়েও পরে অনেক কথাবার্তা হয়েছে। পরে মেজর জলিল এসে পৌছলেন। আসার পরে আমরা খুলনা দখল নিলাম। আমাদের ক্যাম্পটা ছিলো পোলট্রি ক্যাম্প খালিশপুরে। সুলতান সাহেব ছিলেন ক্যাপ্টেন, আমাদের ইউনিটের চার্জে ছিলেন তিনি। ওখানে ৮০০/৯০০ শত মুক্তিযোদ্ধা ছিলো। পরে আমরা জলিল ভাইয়ের সাথে দেখা করলাম। আমার দুইটা ভাইকে যে মেরে ফেললো, আপন বড় চাচার ছেলে, মেঝো চাচার ছেলে। এই কারণে আমার চাচাও ওখানে হার্টফেল করলো। ওখানে একটা কবরস্থান আছে টুটপাড়ায়, ঐ কবরস্থানে আমার চাচাকে দাফন করা হয়। আমরা শুনলাম, দেখতে পেলাম না, কারণ তখন তো আমি যুদ্ধে। ভাইদের লাশও পেলাম না। কিছু লোক ধরলাম সন্দেহ করে, তারা বললো তারা বিহারি। পরে দেশ স্বাধীন হলো, তাদেরকে মেরে ফেলাও যাচ্ছে না, জলিল ভাইয়ের কাছে গেলাম, সে বললো, আইন তোমরা নিজের হাতে তুলে নিওনা। এইভাবে আমরা একটা সময় অতিক্রম করেছি, তবে যুদ্ধকালীন সময়ে দিন কিভাবে

গেলো, রাত কিভাবে গেলো টের পেলাম না। আর মৃত্যুর কথাও ভাবতাম না, ভাবতে পারিনি। ভারতে যখন যাই, পয়সার হাটে একটা পোস্ট অফিস দেখতে পেলাম। চিঠি লিখে গেলাম মায়ের কাছে যে, মা আমি ভালো আছি। দোয়া করবেন আমি যেনো দেশকে মুক্ত করে আবার আপনাদের কাছে আসতে পারি। এই চিঠি যুদ্ধের পরে যখন বাড়িতে আসি, তখন দেখি চিঠিটা পৌঁছেছে অনেক পরে। আমাদের স্মৃতি বেশি বেদনাদায়ক, আমার বন্ধু মারা গেলো,তাকে আমরা কাঁধে করে নিয়ে শুয়ে দিলাম।

অনেক ঘটনা ঘটেছে কিন্তু এতো নির্মমতা,আত্মরক্ষা করা,আমি ও হয়তো মারা যাবো এই রকম অবস্থা, বর্ষার মতো গুলি হতো, যে বাঁচছে সে-তো ভাগ্যের জোরে বাঁচছে। সম্মুখ যুদ্ধ অনেক কঠিন। আর আমরা গেরিলা ছিলাম হিট এন্ড রান। অনেক সময় শত্রুর সামনা-সামনি হতে হয়েছে। কিন্তু হিট এন্ড রান টা ছিলো, আমরা একটা পজিশন নিয়ে থাকবো, আমাদেরকে শত্রু যেন আক্রমণ করতে না পারে কিন্তু আমরা যেন তাদেরকে আক্রমণ করতে পারবো এবং আক্রমণ করে আমরা পালিয়ে যাবো। এটা হলো গেরিলা। একটা ব্রীজ উড়াইয়া দিতে হবে। আমরা গেলাম এক্সপ্লোসিভ দিয়ে একটা ডেন্টানেটর দিয়ে ব্রীজটা উড়িয়ে দিলাম। ফলে পাক আর্মিরা ঐ এলাকায় আর ঢুকতে পারলোনা। খুলনা এলাকার কথা বলছি যে, আমাদের যশোর, খুলনা, মোংলা, বাগেরহাট এসব অঞ্চলে পাক-হানাদার বাহিনীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। আমাদের সহযোদ্ধা, সহকর্মীরা যারা ছিলো তারা প্রত্যেকের ঐ ট্রেনিংও ছিলো। প্রত্যেকেই এটা করার পর সংকুচিত হয়ে আসলো।

পরে আমার মনে আছে ৮ নভেম্বর অপারেশন, এই অপারেশনটা খুব ভয়াবহ হয়েছিল। খুলনা,বরিশাল এবং চিটাগাংয়ে যতো ওদের গানবোট ছিলো সব আক্রমণ করা হলো। এবং বিশেষ করে নেভি, গেরিলা এবং ভারতের হাই অফিসার্স যৌথ অপারেশন ছিলো। যখন আক্রমণ হয় তখন আমরা মোংলায়। তো এই যুদ্ধটা ভয়াবহ ছিলো, কিন্তু এটা সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল জানতোনা, বা ওসমানী সাহেব জানতোনা। এটা ভারতের রণ কৌশল আর

আমাদের যোদ্ধাদের সমন্বয় বিশেষ করে নেভির যারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অফিসার খুলনার গানবোটগুলো মোংলার ওখানে আক্রমণ করে, মোংলার ওখানে আক্রমণ হলো, বিদেশি মালামাল নিয়ে এসেছে কার্গো জাহাজ, ঐখানে দেখলাম দুই পক্ষের সৈন্যের মাঝে গোলাগুলি চলছে, ভারতের সৈন্যের সাথে আর পাক আর্মি সাথে। আমরা এইপাড়ে, ওরা এপারে আসলে আমরা স্বাভাবিক ভাবেই ধরে ফেলবো। কিন্তু এর মধ্যে আমরাই মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে গেলাম। ভারতীয় জাহাজগুলো, বোমারু বিমানগুলো একের পর একটা আক্রমণ করলো, পাকিস্তানি কিছু ছিলো, দুই পক্ষের যুদ্ধে পাকিস্তানি পরাজিত হয়ে গেলো। আমাদের ঐখানে ও কিছু লোক আত্মঘাতী মূলক কাজ হয়েছে, মিত্র বাহিনী বুঝতে পারেনি তারা আমাদের সৈনিকের উপর গুলি করেছে। যারা নদীতে ছিলো, জাহাজ ডুবে গেলো কিছু লোক সাঁতার কেটে উপরে উঠলো। তারপর কয়েকজনকে বন্দি করলো, টর্চার করলো স্থানীয় রাজাকাররা। যখন ভারত আক্রমণ করলো, তখন পাক আর্মি বুঝতে পারলো যে, তাদেরকে পরাজিত হতে হবে। আস্তে আস্তে তারা দুর্বল হয়ে আসলো এবং ক্লোজ হইতে ছিলো। আমাদের আশেপাশে যে ঘাঁটিগুলো ছিলো তারা সব ক্লোজ করে খুলনায় চলে গেলো। আমরাও বুঝলাম তারা নাই এখন আমাদের আগাতে হবে। সবচেয়ে বড় যুদ্ধ হলো নেভিরটা। খুলনা যখন আমরা দখল করলাম, তখন তারা বাঁধা দিয়েছিলো, কিন্তু তারা পারেনি। তারা কোথাও আশ্রায় পায়নি, সব বাঙালি এক হয়ে গিয়েছিল। ততোক্ষণে আমাদের এডভান্স পার্টি খুলনায় ঢুকে গেল, যারা স্থানীয় ছিলো তারাও খুলনায় ঢুকে গেলো, আমি কভারিং পার্টিতে ছিলাম, আমাদের পিছনে আর্টিলারী ছিলো, জলিল ভাই ছিলো, এইভাবে একটা ভয়াবহ সময় কেটে গেলো। যেটা স্বাধীন হওয়ার পরেও আমরা কিছু দিন, মানে স্বাধীনতার যে বিজয়, সেই বিজয় পতাকাটাকে যে কিভাবে অনুভব করবো,সেটা আমরা পারিনি। আমরা মনে করলাম এখনও বুঝি যুদ্ধ চলছে, আমরা যুদ্ধ করবো।

১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু যখন দেশে আসলো, এর আগে মেজর জলিলের সাথে একটা ভুল বোঝাবুঝি হলো তার সাথে আমরা ১৫জন ছিলাম। আমরা যখন

খুলনা থেকে একত্র হয়ে আসতেছি- মিজানুর রহমান বাচ্চু ভাই, মোসলেউদদিন, আমাদের বরিশালের মস্তফা, তারপর আমাদের গেরিলা আলম ছিলো (বিচ্ছু) আলম গৌরনদীর ছিল। আমরা আসতেছি, আমাদের ক'টা মাইক্রোবাস আর জলিল ভাইয়ের গাড়ি। আমাদের পথ রোধ করলো এবং আমাদের হোল্ড করালো। ওখানে গোলাগুলি হলে আমরাও মারা যেতাম, ওরাও মারা যেতো এই রকম একটা পরিবেশ। ওরা পজিশন নিয়েছিলো রাস্তায় । এটা জেনারেল মনজুর বাহিনী, ততক্ষণে মনজু যশোরে চলে আসছে। মনজু কিন্তু জয়েন্ট করেছে নভেম্বরে উনি পালিয়ে আসলো পাকিস্তান থেকে। উনি যশোরে এই সেক্টরে অধিনায়ক হলো, এখান থেকে অর্ডার ছিলো। মেজর জলিল কিছু কিছু বিষয় অপছন্দ করেছিলো এবং উনি ন্যায়ের পথে সত্যের পথে এবং দেশপ্রেমিক একজন সেনা নায়ক হিসেবে তিনি তার চরিত্রটা, তার কথা তার কর্মকাণ্ডে ফুটে উঠেছিল। প্রতিপক্ষ ওনাকে ভুল বুঝলো। পরে আমরা বের করলাম যে আমাদের অপরাধ কি? তখন আমার কাছে এসেলার যখন যশোর সার্কিট হাউসে নিয়ে যায় তখনও আমার কাছে এসেলার ছিলো। তারপর আমাদের অস্ত্র নিয়ে গেলো, রিসিভ দিয়েছিলো। সবাইকে নিয়ে ডিজআর্ম করলো, পরে ওখানে বন্দি করলো। যশোরে আমরা বন্দি অবস্থায় থাকলাম ইনটারগেশন ফেস করলাম। মেজর হুদা ছিল সেখানে যে পরে খালেদ মোশাররফের সাথে ৭ নভেম্বরের কু তে মারা যায়। আমরা বন্দি অবস্থায় থাকাকালীন আমাদের খোঁজ খবর নিয়েছে আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে নাই। এটা একটা পলিটিকাল সিদ্ধান্ত ছিল। আমরা সেখানে ভিকটিম হয়ে ছিলাম। দেশ স্বাধীন বঙ্গবন্ধু ফিরে আসার পরে তিনি আমাদের মুক্ত করে দিলেন। সম্ভবত ২ জানুয়ারি মেজর জলিলকে নিয়ে আসলো তারা ক্যান্টনমেন্টে আর আমাদের কে রেখেছিল সার্কিট হাউজে। ক্যাপ্টেন সুলতান, মোস্তফা ভাই, বিচ্ছু আলম, মিজানুর রহমান বাচ্চু ভাই, আমরা বাকিরা ছিলাম সার্কিট হাউজে। আমার মনে হলো যে আমরা মুক্ত হলাম কিন্তু আমরা মায়ের কাছে যেতে পারবো কি না জানি না, এমন একটা প্রশ্ন আমাদের মনে আসলো যে, দেশ স্বাধীন হলো কিন্তু আমরা ভিক্টিমাইজ হলাম

কেন? এর পিছনে কি আছে? পরে আমরা কারণগুলো জানতে পারলাম। যাহোক পর্যায়ক্রমে আমাদেরকে ছেড়ে দিল এবং আসার সময় আসার খরচ বাবদ কিছু টাকাও দিয়ে দিল। আমরা রকেটে বরিশাল চলে আসলাম। আর অনেকে ঢাকা গেলেন। এই ঘটনাটা ছিল দেশ স্বাধীন হবার পরেও আমাদের জীবনের উপর এটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। সে সময় আমরা যে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছি তা আমাদের হৃদয় পটে মাঝে মাঝে স্মরণ হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম. রুহুল আমিন হাওলাদার, তার যুদ্ধকালীন ক্যাম্প কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমান বাচ্চু ও মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষন কমিটি বাংলাদেশ এর সভাপতি ও উদ্যোক্তা মাসুদুল করিম অরিয়ন

বীর মুক্তিযোদ্ধা আফজাল হোসেন, বরিশাল।

১৯৬৯ সালে আমি ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র ছিলাম, তখন আমি ছাত্র-আন্দোলন, গণআন্দোলন, ছয়দফা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলাম। বঙ্গবন্ধুর ৭ ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য। বঙ্গবন্ধুর ৭ ই মার্চের ভাষণের পর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে দেয়। ১৮ ই মার্চ হল ছাড়তে বাধ্য হলাম। তখন আমার চাচাতো বোন ছিল ময়মনসিংহে, তার স্বামী রেলওয়েতে চাকরি করতেন, ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তার দুটি বাচ্চা নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিল ভান্ডারিয়া, বরিশাল। আমার বাড়ি ছিল বরিশাল শহরে, আমার মা বাবা বরিশালেই থাকতেন। দাদার বাড়ি ছিল ভান্ডারিয়া, আমি ঢাকা থেকে চলে আসি ভান্ডারিয়ায়। ২৫ মার্চের পর আমি আটকা পরে গেলাম দাদার বাড়িতে। ওখানে এক মাস ছিলাম। ওখান থেকে আমি চিন্তা করতে ছিলাম, কিভাবে আমি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবো। আমি থানার সাথে যোগাযোগ করলাম। সেখানে ট্রেনিং নেওয়া যায় কিনা, কিন্তু সেখানে সুবিধা করতে পারিনি। ভান্ডারিয়া থেকে এক মাস পরে, পায়ে হেঁটে আমি বরিশাল শহরে আসি। সকাল পাঁচটার সময় রওয়ানা দিয়েছি, বিকাল পাঁচটার সময় বরিশাল পৌঁছেছি। একজন আত্মীয় ছিলেন সাথে। বরিশাল এসে দেখি, তখনও বরিশালে আর্মি আসেনি। এপ্রিলের শেষের দিকে আর্মি আসছে। বরিশালে উড়োজাহাজ থেকে এ্যাটাক করছে পাক আর্মিরা এবং বোম্বিং করছে। বরিশালের লোকজন শহর ছেড়ে গ্রামে চলে গেছে। শেষে আমাকে বরিশালের কাশীপুর থেকে

পাশ্ববর্তী গ্রামে আমার এক আত্মিয়ের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে। তার তিন দিন পর চলে আসি নিজের বাড়িতে। আমার বন্ধু বান্ধবের ভিতরে অনেকে মারা গিয়েছে আর্মির হাতে। আমার বন্ধু ছালাম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়তো, থাকতো মুহসিন হলে। দুজনে ভাবলাম যে এদেশে থাকা নিরাপদ নয়। আমার বন্ধু সালাম পরবর্তীতে শিক্ষকতা শুরু করেছিল, প্রফেসর সালাম নামে পরিচিত। আমি আর আমার বন্ধু পরিকল্পনা করলাম, কিভাবে বরিশাল থেকে বর্ডার ক্রস করে হাসনাবাদ, নং সেক্টরের আর্মি হেড কোয়ার্টারে যাবো। আমরা যোগাযোগ করলাম, জুন মাসের শেষের দিকে বাসা থেকে অল্প কিছু টাকা নিয়ে বের হয়ে গেলাম। সদর রোড ছালামের বাড়ি, দু'জনে একসাথে রিকশা যোগে বরিশালের নাজিরেরপুলে আসলাম। ওখান থেকে ছোট্ট একটা লঞ্চে চলে গেলাম চাখার। আমার এক পরিচিত বন্ধু এবং বড় ভাই ছিল সে বিএম কলেজে পড়তো, তার ডাক নাম হলো কচি। তাদের বাড়ি ছিল শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হকের বাড়ির একদম পাশে। আমরা কচির সাহায্য নিলাম। ২ দিন সেখানে ছিলাম, শেষে দেখি ওর বাবা ভীষণ ভাবে পাকিস্তানের সাপোর্ট করে। রাতে আমরা চিন্তা করলাম হয়তো আমাদের ধরিয়ে দিবে। উনি বুঝতে পারছেন আমরা মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছি। পরের দিন সকালে আমরা ওদের কিছু না বলে, পালিয়ে চলে গেলাম আমার এক বন্ধু নাসিরের গ্রামের বাড়ি নবগ্রামে। ঐখানে এ্যাডভোকেট মহিউদ্দিন সাহেবের পরিবার ছিল। এ্যাডভোকেট মহিউদ্দিন ছিলেন বরিশালের এমএনএ, তার শালক নাসির আমার বন্ধু ছিল। ঐ বন্ধুর বাড়িতে ৮/১০ দিন ছিলাম। ঐখানে থেকে পরিকল্পনা করলাম, কিভাবে হিন্দু শরণার্থীদের সাথে ইন্ডিয়া যেতে পারি। ওখান থেকে শরণার্থীদের সাথে নৌকায় ফরিদপুর, সাতলা পয়সারহাট পার হয়ে বম্বা বিল হয়ে চলে গেলাম খুলনা, খুলনা রুপসা নদি পার হতে গিয়ে দেখা হলো বঙ্গবন্ধুর ভাই নাসের সাহেবের সাথে, নাসের সাহেবের সাথে পরিচয় হলো, নদী পার হয়ে চলে গেলাম যশোরে। যশোর থেকে আমরা চলতে থাকলাম, বর্ডারে গিয়ে দেখি হাজার হাজার লোক যাচ্ছে এবং দেখলাম রাজাকারেরা পথে চেক করে কোনো মুসলমান যাচ্ছে কি-না। এ কথা শোনার পর ভাবলাম আমাদের হিন্দু পরিচয় দিতে হবে। আমার আর বন্ধুর নাম, বাবার নাম পরিবর্তন করে রাখলাম। তখন আমরা লুঙ্গি পরা ছিলাম, হাতে একটা

পোটলা ছিল, গলায় ছিলো গামছা। গামছার একপাশে চিড়া আর আরেক পাশে ছিলো গুড় বাঁধা। ঐগুলো খেয়ে আমাদের ২/৩দিন কেটেছে, তারপর যেদিন বর্ডার ক্রস করবো, তার আগের দিন রাতে, আমরা এক বুড়ি মায়ের ঝুপড়ি ঘরে হাজির হলাম। বুড়ী মা ঝুপড়ি ঘরে একা থাকেন। পাশে দুটি ছাগল থাকে। বললাম বুড়ী মা রাতে থাকার একটু জায়গা দেওয়া যায়। সে বললো কোথায় থাকবে, আমার তো একটাই ঘর, এখানে তো আমি থাকি। তোমরা ছাগলের ঘরে ঘুমাতে পারো, আমাকে ২ টাকা দিলেই হবে। আমি আর বন্ধু এতোটাই ক্লান্ত ছিলাম, ঐ ছাগলের ঘরে ঘুমিয়ে পড়লাম। বুড়ী মাকে বললাম ভোর পাঁচ টার সময় জাগিয়ে তুলতে। বুড়ী মা পাঁচ টার সময় জাগিয়ে দিলেন। আমরা সকালে হাটা শুরু করলাম, বর্ডার ক্রস করার সময় যশোরে একটা রেল লাইন ছিল, সেখানে আর্মি পাহারায় ছিল, ভোর পাঁচ টায় নামাজের জন্য এক ঘন্টা বর্ডারের পাহারা বন্ধ ছিল। এই সুযোগে আমরা বর্ডার ক্রস করি, সন্ধ্যার সময় বসিরহাটে গিয়ে হাজির হলাম। সেখান থেকে বাসে করে চলে গেলাম কলকাতা, কলকাতায় আমার এক বন্ধু ছিল সংকর, বরিশালের সিনেমা হলের মালিকের ছেলে। ওর ওখানে গেলাম, কিন্তু ওর বাড়ি ভর্তি লোক তাই সকালে ওদের একটা স্টুডিওতে রাতে আমাদের থাকার ব্যাবস্থা করলো। ওখানে ৪/৫ দিন থাকার পর আমরা চলে গেলাম হাসনাবাদ ৯নং হেড কোয়ার্টারে। সেখানে গিয়ে দেখি বরিশালের অনেক বন্ধু বান্ধব, পরিচিত লোকজন। মেজর জলিল সাহেবের সাথে দেখা হলো, ওখানে আমরা শরণার্থী হিসাবে ছিলাম। ওখান থেকে আমরা চলে গেলাম চাকুলিয়াতে। ওখানে আমরা ১ মাসের ট্রেনিং নিলাম, আমার সাথে তোফাজ্জল ভাই, কুতুব, পরিমল, তারেক, ড. সালাম আরো অনেকেই ছিল। একমাস হার্ড ট্রেনিং এ বিভিন্ন রকম অস্ত্র চালনা শিখলাম এক্সপ্লোসিভ ট্রেনিং পেলাম, ট্রেনিং এর শেষের দিন আমাদেরকে জয়বাংলা প্যারেডের সময় একটা ডামি যুদ্ধ করতে হয়েছিল, তখন আমাদেরকে এক রাত জঙ্গলে থাকতে হয়েছে, আমি জঙ্গলের ভিতর শুয়ে আছি এমন সময় একটা কেউটে সাপ আমার থেকে দেড় ফিট উপর দিয়ে এদিক থেকে ওদিকের গাছের ডালে যাচ্ছিল, তখন আমি সাপের দিকে তাকিয়ে দেখে লাফ দিয়ে সরে গেলাম, সেদিন যদি সাপটা আমাকে কামড় দিত তাহলে ঐ দিনই আমার মৃত্যু হতো। এমন অনেক ঘটনা

আছে যা বলে শেষ করা যাবে না। ট্রেনিং শেষে আমরা হাসনাবাদে ফিরে এলাম। তখন পরিচিত হলাম ক্যাপ্টেন মাহফুজ আলম বেগ (সাব-সেক্টর কমান্ডার ৯ নং সেক্টর) ভাইয়ের সাথে। মেজর জলিল সাহেব আমাকে দেখে বললেন তুমি ইউনিভার্সিটির ছাত্র শারীরিক অবস্থা খুব ভালো তুমি থার্ড ব্যাচে আর্মি অফিসার ট্রেনিং নিবার জন্য যাবে। আমি বললাম স্যার আমি এক মাসের ট্রেনিং নিয়েছি, এখন আমি দেশে যুদ্ধে যেতে চাই, যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে আছি। তখন আমাকে বেগ সাহেবের সাথে দেয়া হলো হিঙ্গলগঞ্জ ক্যাম্পে। ক্যাপ্টেন মাহফুজ আলম বেগ একজন প্রচুর সাহসী যোদ্ধা ছিলেন, আমি তার সাথেই বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা শুরু করলাম। ওখান থেকে আমি অনেক ছোট খাট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি সুন্দরবনের ভিতরে ও বাহিরে। আগস্ট মাসের শেষের দিকে পার্টিকুলারি আমকে একটা এ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হলো ব্যাটখালি ওখানে বিওপি ছিল, সেখানে দিনের বেলা পাকিস্তানি আর্মি ও তাদের মিলিশিয়ারা পাহারায় থাকতো, রাত্র বেলা খালি থাকতো এবং কোন পাহারা থাকতো না। আমাকে বলা হয়েছিল ওই ক্যাম্পটাকে (বিল্ডিং) উড়িয়ে দেবার জন্য। রাতের অন্ধকারে আমার কিছু সাথী তারেক, পরিমল, সালাম সহ আরও কয়েকজনকে নিয়ে এক্সপ্লোসিভ দিয়ে সম্পূর্ণ বিল্ডিংটাকে আমরা উড়িয়ে দিলাম (আগস্ট মাসের শেষের ঘটনা)। এবং এটা ছিল আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। তার পর আরও ছোট খাট যুদ্ধ হয়েছিল। মূলত আমাদের মেইন উদ্দেশ্য ছিল হিট এন্ড রান, কেননা আমাদের সেই ধরনের সামর্থ বা অস্ত্র ও পরিকল্পনা ছিল না যে তাদের সামনা সামনি যুদ্ধ করবো। ওদেরকে মাত্র ভয় দেখানো এবং আমাদের শক্তির জানান দেওয়া ছিল আসল উদ্দেশ্য। তারপর ঐ এলাকা মুক্ত হল এবং এক সপ্তাহ পরে মুন্সিগঞ্জের দিকে আমরা অগ্রসর হলাম। মুন্সিগঞ্জে একটা ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল (রাজারবাগ ট্রেনিং ক্যাম্প) সেখানে আর্মি ছিল ও ক্যাপ্টেন মইন ছিল। পরবর্তীতে ওখানে আমাকে একটা দায়িত্ব দিল রকেট লাঞ্চার ফায়ার করার, আমরা আর্মি ক্যাম্পের তিন দিকে ঘেরাও করি, খুব ভোর বেলা, প্রায় ৫ টার দিকে। সূর্য ওঠার আগে আমাকে ফাস্ট ফায়ারিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হল এবং রকেট লাঞ্চার ফায়ার করার। তো আমার সাথে একজন সহযোগী যোদ্ধা সালাম ছিল যে রকেট লাঞ্চার লোড করবে তার নাম আমার খেয়াল নেই।

সেখানে আমকে নিদৃষ্ট সময় দেওয়া হলো এবং আমি ক্যাম্পের মাঝে রকেট লাঞ্চার ফায়ার করলাম। আর রকেট লাঞ্চার ফায়ার করা একদম ইজি। আর এটা আমার একটা বিরাট স্মতৃি হয়ে গেল। তারপর চার দিক থেকে ফায়ারিং করল, সেখানে অনেক লোকজন মারা গেছে এবং আমরা এই সুযোগে অনেক অস্ত্র হস্তগত করেছি। এটা একটা বিশেষ ঘটনা। তারপর মুন্সিগঞ্জে অনেক দিন ছিলাম সেখানে অনেক ছোটখাট ঘটনা ঘটেছে, এছাড়া সুন্দরবনের ভিতরে আমি অনেক অপারেশন করছি। সুন্দরবনে আমাদের একজন গাইড ছিল তার নাম হলো নবাবদী ফকির, সে আমদের গাইড করে নিয়ে যেত। আমরা সেখানে অনেক ভয়ে ছিলাম, যেমন- বাঘের ভয় ও অন্যান্য প্রাণীর ভয়। আমরা অনেক কষ্ট করে সেখানে থেকেছি এবং ছোট খাট যুদ্ধ করেছি। যাহোক পরবর্তীতে নভেম্বরের দিকে আমরা আরো সামনের দিকে অগ্রসর হলাম এবং এক পর্যায়ে আমরা শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) গেলাম। শ্যামনগর গভর্নরের ওখানে দো'তলা বাড়িতে একটা রাজাকার ক্যাম্প ছিল যেখানে রাজাকরদের ট্রেনিং দেওয়া হতো। ওই ট্রেনিং ক্যাম্পটা উড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হল। বেশ আমরা পরবর্তীতে এক্সপ্লোসিভ দিয়ে বাড়িটি উড়িয়ে দিলাম। বাড়িটি উড়াতে গিয়ে আমার সাথে অনেকেই ছিল যাদের নাম আমি আগেও বলেছি এবং এছাড়া আরো অনেকে ছিল যাদের নাম খেয়াল নেই। আমি প্রথম বারে পুরো বাড়িটি উড়িয়ে দিতে পারি নাই, কেননা সেখানে এক্সপ্লোসিভ কম হয়ে গিয়েছিল এবং বিভিন্ন কর্ণারে এক্সপ্লোসিভ লাগানো হয়নি। আর আমাকে যেভাবে বলা হয়েছিল আমি ঠিক সেইভাবে করতে পারি নি। পরে আমি ওয়াকিটকির মাধ্যমে জানালাম যে আমি পুরো বাড়িটি ধ্বংস করতে পারি নি। তখন আমার কমান্ডার আমাকে ধমক দিয়ে বললেন যে আমি যেভাবেই হোক বাড়িটিকে মাটির সাথে মিশে যেতে দেখতে চাই। পরবর্তীতে উনি নিজে আরও কিছু এক্সপ্লোসিভ নিয়ে আসল এবং সেগুলো লাগিয়ে পুরো বাড়িটা ধ্বংস করে দেই। সেখানে আমি ও আমার সাথে অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল (কুতুব, পুতুল,পরিমল,ছালাম, তারেক ও আরো অনেকে। পরবর্তীতে আমারা বেগ সাহেবের নেতৃত্বে বরিশালের দিকে রওনা করি এবং বরিশাল যেতে যেতে আরও অনেক ছোট ছোট যুদ্ধ করি। তারপর আমরা ১৭ ডিসেম্বর (স্বাধীনতার এক দিন পর) বরিশালে গিয়ে

পৌঁছালাম। পথে আমরা ১৬ ডিসেম্বর নানাভাবে স্বাধীনতার উল্লাস প্রকাশ করলাম। সেখানে অনেক মুক্তযোদ্ধার সাথে পরিচয় হয়েছে। এবং সেখানে মেজর জিয়া সাহেবের সাথেও আমাদের দেখা হইছে। যাহোক সে অনেক ঘটনা। তারপর আমরা বরিশালে এসে প্রথমে উঠলাম হাতেম আলী কলেজের মাঠে। সেখানে প্রায় ১৫০ জনের মতো মুক্তযোদ্ধা ছিলাম। পরবর্তীতে ওয়াপদা কলোনীর ওখানে কিছু পাক আর্মি ছিল তাদেরকে আমরা ১৮ তারিখে স্যারেন্ডার করতে বলি। কিন্তু তারা স্যারেন্ডার করতে চায়নি। তারপর আমরা মাইকে এনাউন্স করলাম, যে আমরা তোমাদের চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলেছি। তোমরা স্যারেন্ডার করো, তা না হলে তোমদের বাঁচার কোন উপায় নেই। তো পরবর্তীতে তারা স্যারেন্ডার করলো এবং আমরা ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকি এবং ক্যাম্পের ভিতরের সব অস্ত্র-সস্ত্র আমাদের কব্জায় নিয়ে আসি এবং তখন আমাদের পুরো নেতৃত্বে ছিলেন বেগ সাহেব। পরবর্তীতে আমি শিকারপুর এলাকায় বেগ সাহেবের নেতৃত্বে আরও কিছু আর্মিদের স্যারেন্ডার করিয়েছি। তারপর আমি বরিশালে অবস্থান করলাম এবং বরিশাল সার্কিট হাউজে শিফ্ট হলাম। সেখানে আমাদের প্রধান ক্যাম্প ছিল। কিছু দিন পর বেগ সাহেব ও তোফায়েল ভাই ঢাকায় চলে গেলেন এবং আমি বরিশাল সার্কিটহাউজে মাস খানেক অবস্থান করলাম। সেখানে প্রসাশন কাজে সাহায্য করতাম এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন বিচার আচার করতাম। আমাদের কাছে অনেক বিচার আসত আর আমি আমার বন্ধুদের নিয়ে এগুলো করতাম। আরও একটি মজার ঘটনা আছে, সেটা হলো আমি অনেক সিগারেট খেতাম। আর আমি যখন ভারতের ট্রেনিং এ ছিলাম তখন আমাকে ৭৫ টাকা করে বেতন দিত আর আমি সেই সময় চারমিনা সিগারেট খেতাম। আমরা পরবর্তী সময়ে যখন বাংলাদেশে আসলাম তখন আমাদের বরিশালে রাজনৈতিক নেতা ছিল নুরুল ইসলাম মঞ্জু। সে আমার কাছে তিন লক্ষ টাকা দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের বেতনের জন্য। তো সে টাকা আমি সার্কিট হাউজের খাটের নিচে রাখা ছিল। অথচ আমার সিগারেট খাওয়ার পয়সা নাই। এটি একটি বিরল ঘটনা। আমার কখনও মনে হয় নাই যে বস্তার ভেতর থেকে টাকা নিয়ে সিগারেট খাই। সেই বাংলাদেশই এই বাংলাদেশ, এটাই আমাদের দুঃখ। এখন শুনি ব্যাংক থেকে কোটি কোটি টাকা চুরি হয়ে

যায়, কেউ আবার আত্মসাৎ করছে। আর মানুষ জন কি করতেছে না করতেছে। এই হলো বাংলাদেশের অবস্থা। আমরা কি দেশ চাইলাম আর কি দেশ হইল। আমরা তো এই বাংলাদেশ দেখতে চাই নাই, আমরা দেখতে চেয়েছিলাম আরও উন্নত সমৃদ্ধশীল বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ। আমাদের দেশ স্বাধীন করছি, দেশের মানুষের জন্য, কিন্তু এখনও অর্থনৈতিকভাবে আমাদের দেশ পুরোপুরি স্বাধীন হয় নাই। সুতরাং আশা করি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি এইগুলো দেখবে মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ সম্মান দিবে।

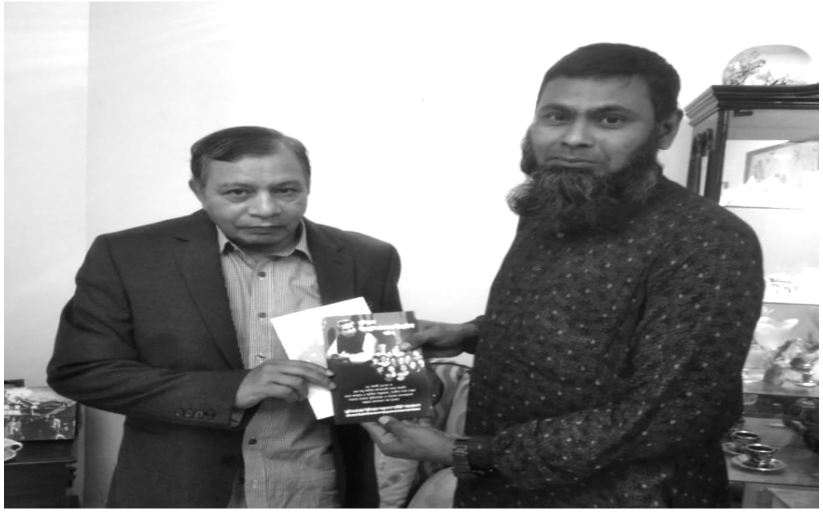

মুক্তিযোদ্ধাদের যতদিন এই দেশ সম্মান দিতে না পারবে, এই দেশ সামনে এগোনো খুব কঠিন। এখন দেখছি আমাদের অনেক বন্ধুবান্ধব হারিয়ে গেছে। বাকিরাও হয়তো কিছু দিনের মধ্যে বিলীন হয়ে যাব। কিন্তু আমরা চাই এই দেশের মানুষ সুস্থ থাকুক, ভালো খাকুক। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ হোক। কোন রকম হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না। মানুষ মানুষের জন্য থাকবে। আশা করি এই দেশ রাজাকারদের হাতে থাকবে না ও স্বাধীনতা বিপক্ষের শক্তির হাতে যাবে না। এই আমার শুভ কামনা।

বীর মুক্তিযোদ্ধা
আলহাজ্ব ফরিদ উদ্দিন আহমেদ
কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

আমি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলে শুনলাম পাকিস্তানিরা নিরিহ বাঙালির উপর নানানভাবে অত্যাচার করতেছে, মা-বোনের ইজ্জত হরণ করতেছে গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে উজাড় করে দিচ্ছে, একদিন শুনলাম আমার পাশের গ্রামের ১৬ জন মহিলা ধরে নিয়ে গেছে এবং তার পাশের আরেকটি গ্রামের একটা বাড়িতে একটা বৃদ্ধ মহিলা ছিলেন তাকে পাকিস্তানিরা ধর্ষণ করে মেরে ফেলেছে, তখন আমার এক বন্ধু এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানা সুলতানপুর গ্রামের সুবেদার হেলাল, আমরা তিন জন মিলে ইন্ডিয়া চলে যাই, ইন্ডিয়া গিয়ে প্রথমে আমরা হাপানিয়া তিতাস ক্যাম্পে উঠি। সেখানে আমরা রিক্রুট হওয়ার পরে বাগমারা নামক স্থানে আমাদের ট্রেনিং হয়েছে। ২১ দিন পর্যন্ত আমরা ইন্ডিয়ান অফিসারদের আন্ডারে ট্রেনিং করেছি। আমার প্রশিক্ষকদের নাম ছিল এ.এস. চৌহান, গোলাম আলী খান, মুরদার সিং, নরেন সিং প্রমুখ। ২১ দিন ট্রেনিং শেষে আমাদেরকে পাঠানো হলো মেলাগড় হেডকোয়ার্টারে। তখন মেলাগড়ে দুই নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন খালেদ মোশারফ সাহেব। টুআইসি ছিলেন মেজর হায়দার। সেখানে দুই মাস অপেক্ষা করার পরে হঠাৎ করে আমাদেরকে কসবাতে ডিফেন্সে পাঠানো হলো। যেদিন আমরা ওখানে পৌছালাম সেদিনই আমাদেরকে ডিফেন্সের ডিউটি দেয়া হলো। ওই দিন রাত্রে কসবাতে যে কল্যাণ সাগর টা আছে, সেটার পশ্চিম পাড়ে পাকিস্তানিরা এবং পূর্বপাড়ে আমরা, আমাদের ডিফেন্স হলো কসবা থানা। তখন হঠাৎ করে রাত্র ১২ টা বা ১ টার দিকে পাকিস্তানিরা কসবা স্টেশনে এসে আস্তানা গাড়তে শুরু করে। এমন সময় খবর হয়ে গেল যে আমাদের ডিফেন্স টা ভিতরে পড়ে গেছে, বগাবাড়ি স্টেশনে আমাদের একটা পেট্রোল ডিউটি ছিল

তখন, আবেদ এবং আর একজনের নাম আমার স্মরণ নেই, আবেদ পুলিশে চাকরি করতো, আবেদ ছিল সামনে এবং পিছনে ছিল সেই ছেলেটা, তার বাড়ি কামালপুর, ওরা পাকিস্তানিদের হাতে ধরা পড়ে যায়। ধরা পড়ার পরে ওই ছেলেটা সুযোগ বুঝে দৌড় দেয় দৌড়াতে দৌড়াতে প্রায় একমাইল গিয়ে আমাদের লোকদের ডাক দেয় এবং সেখানে আমাদের একজন এলএমজি ম্যান ছিল, সে বুঝতে পেরে কাছাকাছি আসলে ব্রাস ফায়ার করে ৫ জন পাকিস্তানি আর্মিকে মেরে ফেলে। এবং ওরা হেডকোয়ার্টারে চলে যায়, যাওয়া পরে পরের দিন সেখানে, খালেদ মোশারফ সাহেব, ক্যাপ্টেন আশরাফ, ক্যাপ্টেন গফুর, ক্যাপ্টেন সুজাত আলী, ক্যাপ্টেন আইনুদ্দিন ওনারা সবাই আসলেন। এসে ওনারা বললেন পাঞ্জাবিরা যদি কসবা স্টেশনে থাকে তাহলে আমাদের ইন্ডিয়া থেকে যুদ্ধ করা লাগবে। এবং তারা চিন্তা করল আমাদেরকে ওদের আক্রমণ করতে হবে। তখন রাত তিনটা থেকে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, পরের দিন দুপুর তিনটা পর্যন্ত যুদ্ধ হলো, এদিকে খালেদ মোশারফ সাহেব তার মাথায় আঘাত পেলেন, যুদ্ধ শেষে আমরা কসবা দখল করতে সক্ষম হলাম। ওই দিন ছিল রোজার দ্বিতীয় দিন। ওই যুদ্ধে আমাদের ২৪ জন শহিদ হলেন। কসবা নতুন বাজার এবং পুরনো বাজারের ভিতরে একটা খাল ছিল, পাঞ্জাবি খালের ভিতরে গিয়ে পড়ল। ওদের অনেক লাশ পড়েছিল। এই যুদ্ধটা ছিল আমার একটা বড় স্মৃতি। এমন অনেক স্মৃতি আছে তার ভিতরে আরেকটা হলো আমরা মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে যখন আবার দেশের ভেতরে এসে পড়লাম, আমরাতো গেরিলা ছিলাম, গঙ্গাসাগর দিয়া ইন্ডিয়ান সোলজার এবং যৌথবাহিনী, সাঁজোয়া যান নিয়ে এগোতে লাগলো, আগাতে আগাতে কড্ডা নামক একটা গ্রাম আছে, সেই গ্রামের পাশে হলো রেল লাইন তার পাশে পাকিস্তানিরা আস্তানা করে ইন্ডিয়ার দিকে মুখ করে গোলাগুলি করতেছে। এমন সময় ওরা জানেনা যে মুক্তিযোদ্ধা আসছে, আমরা গ্রামবাসীদের সরিয়ে দিয়ে পাঞ্জাবিদের উপর আক্রমণ করলাম। ওরা ভেগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে চলে গেল। আমাদের ডিফেন্স সিএন্ডবিতে উঠে গেল, আমার সাথে প্রায় ৩০ জন ছিল, আমি ছিলাম প্লাটুন কমান্ডার, তখন আমরা চিন্তা করলাম সিএন্ডবি রোড এর পূর্ব পাশে যে রাজাকার ও দালালরা আছে তাদেরকে আমরা ধরবো, ইন্ডিয়ান অফিসাররা জিজ্ঞাসা করল আপনারা কেমন আছেন, আমরা বললাম ভালো আছি। তারা আবার বলল পাঞ্জাবি কিধার হে, আমরা দেখিয়ে দিলাম ওরা কুমিল্লার দিকেও

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে গিয়েছে, পরে আমি মান্দাইল নামক এক গ্রামে রইলাম সারা রাত, সকালে আমি দাঁত মাজন করতেছি এমন সময় আমার সামনে পাঁচ ছয় জন লোক দৌড়ে আসলো, তারা বলল এখানে কমান্ডার কে? আমি বললাম আমি কমান্ডার, তখন তারা বলল ওইখানে একজন পাকিস্তানি আর্মি অস্ত্র নিয়ে বিলের মধ্যে বইসা আছে একটা টিলায়। আমি তাদের বললাম ওই বাড়িতে বিশ পচিঁশ জন মুক্তিযোদ্ধা আছে তাদেরকে সংবাদ টা দিন, তারা যেন চারিদিক থেকে দৌড়ে গিয়ে ঘিরে ফেলে, আমি আমার এসএমজি নিয়ে দৌড় দিলাম, আমি দৌড়ে গিয়ে পাকিস্তানি আর্মিটার কাছে গেলে ও দৌড় শুরু করল আমি তার পিছনে পিছনে দৌড়াই এবং গুলি করতে থাকি, আমি বলতেছি জোরে জোরে, হোল্ড, হ্যান্ডস আপ, পরে অপর দিক থেকেও মুক্তিযোদ্ধারা তাকে ঘিরে ফেলল এবং ফায়ার করতে লাগলো, তখন সে দাঁড়িয়ে গেল এবং হাত ওপরে করে থাকলো, আমরা তাকে নিরস্ত্র করে ধরে নিয়ে আসলাম, তার নাম ছিল সাদেক, তার বাড়ি ছিল আজাদ কাশ্মীর, বয়স ছিল ১৮ বছর, সে প্রায় দুই মাস আমার বাড়িতে ছিল, সে আমাকে বলেছিল আপনারা যদি আমাকে রাখেন আমি সারা জীবন আপনাদের কাছে থাকবো এবং আপনাদের কাজ কাম করব, আমি তাকে ইন্ডিয়া পৌঁছে দিয়েছিলাম পাকিস্তানিরা যারা সারেন্ডার করেছিল তাদের সাথে তাকে নিয়ে গেল, এটা ছিল আমার মুক্তিযুদ্ধের বিশাল একটা স্মৃতি, একটা পাকিস্তানিকে ধরে আমি দুই মাস রেখেছিলাম আমার বাড়িতে, তোমরা যারা নতুন প্রজন্ম আছো তাদের জন্য আমার চিন্তাধারা এটাই, সঠিক ইতিহাস তোমরা খোঁজো , জানো এবং নিজেদের ভিতর ধারণ করো, অনেক ভুয়া এখন তৈরি হয়েছে তার থেকে বেরিয়ে এসে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ ও লালন করে এগিয়ে যেতে হবে, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

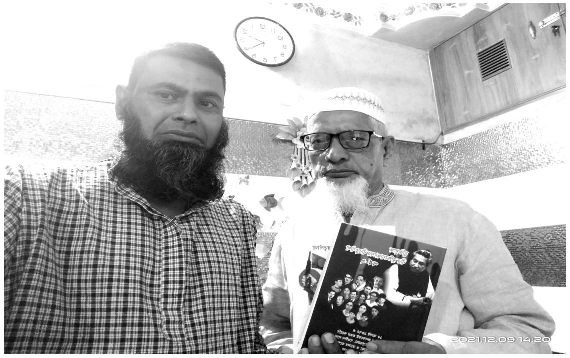

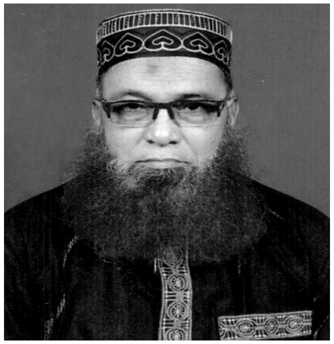

বীর মুক্তিযোদ্ধা
আলহাজ্ব মোঃ জহুর-ই-আলম
মাগুরা।

ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে বাংলাদেশে গমন এবং যুদ্ধকালীন কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন।

০৭ ই মার্চ বাঙালি জাতির জীবনে একটি ঐতিহাসিক দিন, ১৯৭১ সালের ০৭ ই মার্চ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক বিশাল জনসমাবেশে ভাষণ দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের সূচনা রচনা করেছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ভাষণে বলেছিলেন, "তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো" তোমাদের কাছে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তা ঘাট যা যা সব কিছুই আছে, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা তা বন্ধ করে দেবে। এই বক্তব্যের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি গেরিলা যুদ্ধের দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই ডাকে সাড়া দিয়ে আমি কুমিল্লা ময়নামতি সার্ভে ইনস্টিটিউটে সার্ভে ডিপ্লোমা থেকে অধ্যয়নরত অবস্থায় গ্রামের বাড়িতে চলে আসি। আমাদের গ্রামের আমি, এ.কে.এম. ইদ্রিস আলী, আব্দুল লতিফ, আব্দুর রাজ্জাক সর্দার, বড়বাড়ির অজিত মণ্ডল, সুধীর কুমার বিশ্বাস, আবু জাফর মোল্লা, পাথরার আব্দুর রাজ্জাক খান এবং নলদাহ সুশান্ত কুমারকে সঙ্গে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হই। দুলাল মন্দির পার হইয়া সুবিতপুর গ্রামে আব্দুর রহমানের বাড়িতে রাত্রি যাপন করি। ২০ শে জুন ১৯৭১ রানাঘাট ইয়ৎ ক্যাম্পে ভর্তি হই। ভর্তি হওয়ার পর মরহুম জননেতা এ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান এম.পি.এ এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। ৩০ শে জুন তারিখ পর্যন্ত রানাঘাট ইয়ুথ রিসিপশন ক্যাম্পে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। রানাঘাট হতে উচ্চতর

প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হয়ে কল্যানী হেড কোয়ার্টারের মাধ্যমে বিহার প্রদেশের বিরভূম জেলার চাকুলিয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠান। সেখানে মাসাধিককাল উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ (এফ.এফ. গেরিলা) করি।

চাকুলিয়া প্রশিক্ষণ শেষে আমাদেরকে কল্যাণের মাধ্যমে বয়রা বর্ডার ক্যাম্পে সম্পৃক্ত করেন। সেখানে অবস্থানকালে ৫/৭ মাইল দূরে কাশিপুর হয়ে প্রতিনিয়ত ছুটিপুর ঘাটিতে সেলিং করা, পাক সেনাদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার জন্য এ্যাম্বশ করা হতো। কাশিপুর যুদ্ধে ভারতীয় সেনা সদস্যদের সহযোগিতায় আমি আমার গ্রুপসহ যুদ্ধ করি এবং এ যুদ্ধে ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ পাক বাহিনী টুইস মর্টারের গুলিতে আহত হয়ে পুকুর পাড়ে শহিদ হন। আমরা উনার জানাযা ও দাফন কার্য পুকুর পাড়ে সম্পন্ন করি। ৭/৮ দিন পর বয়রা ক্যাম্প থেকে আমাকে গ্রুপ কমান্ডার করে (৫৫) পঞ্চান্ন জন সহযোদ্ধার মধ্যে আমার নামে এস.এম.জি, ও অন্যান্য সহযোদ্ধাদের নামে যথাক্রমে এল.এম.জি, এস.এল.আর, থ্রিনটথ্রি (৩০৩) রাইফেলস, গ্রেনেড ও গোলাবারুদ ইস্যু করে বাংলাদেশে প্রেরণ করেন।

আমি যুদ্ধকালীন কমান্ডার হিসেবে বাংলাদেশে ঢোকার পথে দুলাল মন্দির নামক স্থানে পাক হানাদার বাহিনীর চলতি গাড়ি লক্ষ করে এলোপাতাড়ি গোলাগুলি শুরু করি। এতে পাক হানাদার বাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে পাল্টা গোলাগুলি করে। আর আমরা পিছু হটে আখ ক্ষেতে পজিশন নেই। পাক হানাদারদের গুলিতে আমার সহযোদ্ধা মোহাম্মদ কওসার আলী শহিদ হন এবং অপর সহযোদ্ধা মাগুরা সদর উপজেলার তৎকালীন হাজরাপুর বর্তমানে রাঘবদাইড় ইউনিয়নের মো. আবু বক্কার সিদ্দিক আহত হন।

সেখান থেকে আসার পথে সুইতলা মল্লিকপুরে রাজাকারদের সাথে সংঘর্ষ হয়। এরপর আমি আমার গ্রুপের সহযোদ্ধাদের নিয়ে ধনেশ্বরগাতী গ্রামে নগেন মাস্টারের বাড়িতে রাত্রি যাপন করি। পরের দিন ধনেশ্বরগাতী কুটি বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপন করি। ৩/4 দিন অবস্থান করার পর গজদুবক্ষা গ্রামে রাজাকারদের সাথে সংঘর্ষ হয়।

শ্রীপুর থানা দখল :

৫ আগস্ট ১৯৭১ আমার গ্রুপ সহ শ্রীপুর আঞ্চলিক বাহিনীর অধিনায়ক আকবর হোসেন মিয়ার বাহিনীতে এসে যোগদান করি। শ্রীপুর বাহিনীর অধিনায়ক আকবর হোসেন মিয়া ও উপ-অধিনায়ক মোল্লা নবুয়ত আলীর নেতৃত্বে বিভিন্ন

এলাকায় যুদ্ধ করি এবং শ্রীপুর বাহিনীর সাথে শ্রীপুর থানা দখল করি সেখানে ৩৪ টি রাইফেলস ও ১৫০০ গুলি উদ্ধার করা হয়।

কুটিবাড়ী ক্যাম্পে ফিরে আসা, লক্ষীপুর বাজার আক্রমণ এবং আড়ুয়াপাড়া বাজারে রাজাকারদের সাথে যুদ্ধ :

সেখান হতে ৩রা সেপ্টেম্বর আমার পূর্ববর্তী ক্যাম্প ধনেশ্বরগাতী কুটিবাড়ি ফিরে আসি।

৫ সেপ্টেম্বর লক্ষীপুর বাজার আক্রমণ করি এবং রাজাকারদের হটিয়ে দেই। ১২ সেপ্টেম্বর আড়ুয়াপাড়া বাজারে রাজাকার ও দুস্কৃতিদের সাথে সংঘর্ষ ঘটার পর একজন দুস্কৃতিকারী আমার গ্রুপের গুলিতে নিহত হন।

তালখড়ি যুদ্ধ : ১৩ সেপ্টেম্বর শালিখা থানার তালখড়ি নামক গ্রামে আমি আমার সঙ্গীদের ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে পাক হানাদারদের সাথে যুদ্ধ করার সময় ০৭ জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন।

ইছাখাদার যুদ্ধ : ২৬ সেপ্টেম্বর আমার নেতৃত্বে ইছাখাদা নামক স্থানে যুদ্ধ হয়, এ যুদ্ধে আমার নিজ গ্রামের সহযোদ্ধা মো. আব্দুল লতিফ, মো. আব্দুর রাজ্জাক, মো. এ.কে.এম ইদ্রিস আলী এবং তৎকালীন হাজরাপুর বর্তমানে রাঘবদাইড় ইউনিয়নের মাঝাইল গ্রামের আমার গ্রুপের অপর সহযোদ্ধা মো. আবু বক্কার সিদ্দিক, মো. আব্দুস সত্তার কৃতিত্বপূর্ণ সম্মুখ যুদ্ধ করেন এবং এ যুদ্ধে পুলের কাছে সাত (০৭) জন রাজাকার নিহত হয়।

হাওড়ের যুদ্ধঃ ৬ ই অক্টোবর আমি আমার গ্রুপ সহ হাওড়ে যাওয়ার পথে পাক হানাদার বাহিনীর গাড়ি লক্ষ করে গোলাবর্ষণ করে সেখান থেকে সরে পড়ি।

বিনোদপুরের যুদ্ধ : ৮ ই অক্টোবর অধিনায়ক আকবর হোসেন মিয়ার নেতৃত্বে আমার গ্রুপের সহযোদ্ধাদের নিয়ে বিনোদপুরে রেঞ্জার পুলিশ ও রাজাকারদের সাথে তুমুল যুদ্ধ করি। এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা মুকুল শহিদ এবং গোলাম মোস্তফা গুলিবিদ্ধ হন। এছাড়া ০৪ জন রাজাকার মারা যান।

কাজলীর যুদ্ধ : ১০ ই অক্টোবর আকবর হোসেন মিয়ার নেতৃত্বে আমি আমার গ্রুপের সহযোদ্ধাদের নিয়ে কাজলী ঘাটে যুদ্ধ করি। পাকিস্তানি বাহিনী নদী পার হওয়ার চেষ্টা করলে তাদের উপর আক্রমণ করি। বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার হতাহত হয়।

টিকারী বাজারের যুদ্ধ : ১৬ অক্টোবর টিকারী বাজারে আমার নেতৃত্বে পাক হানাদার ও রাজাকারদের সাথে যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে (০১) এক জন পাক সেনা

নিহত হয়।

পুনরায় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প কুটি বাড়ি ফিরে আসা : ২০ অক্টোবর আমার গ্রুপের (৫৫) পঞ্চান্ন জন সহযোদ্ধা কুটিবাড়ি ক্যাম্পে অবস্থান করেন। পরের দিন ২১ তারিখে আমি ২২ জনকে সাথে করে তিতারখাঁ পাড়া গ্রামের আলি আহম্মদের বাড়িতে রাত্রি যাপন করি।

জাগলা ব্রিজে যুদ্ধ : ২১ তারিখে আলি আহম্মেদের বাড়িতে অবস্থানরত অবস্থায় ঐ দিন জানতে পারলাম যশোর হইতে জাগলা ব্রিজের উপর দিয়ে পাক সেনারা বিভিন্ন মালামাল নিয়ে তাদের বিভিন্ন গন্তব্যে এই পথে যাতায়াত করে। কারণ পাকসেনাদের যশোর খুলনা মহাসড়কে চলাচলের একমাত্র রুট বা গন্তব্য পথ, এ জায়গা দিয়ে তাদের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রসদ (মালামাল/অস্ত্র ও গোলাবারুদ) আসত।

২২ অক্টোবর আমি আমার গ্রুপের সকল সহযোদ্ধাদের নিয়ে বিকেল বেলা নৌকাযোগে জাগলা ব্রিজের উত্তরে রাস্তার পূর্ব পাশে পুকুড়পাড়ে অবস্থান নিই এবং ব্রিজের বর্ডার ভাঙ্গতে শুরু করি যেন পাক বাহিনীদের জীপ গাড়ি সে রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে না পারে সে লক্ষ্যে ব্রিজের বর্ডার ভাঙ্গতে শুরু করি। পূর্বেই এখানে রাজাকারদের ক্যাম্প ছিল, রাজাকার মারফত সংবাদ পেয়ে পাকসেনারা ব্রিজে এসে ব্রিজের দক্ষিণপাশে অবস্থান নিয়ে আমাদেরকে লক্ষ করে গোলাগুলি শুরু করলে আমরা ব্রিজের উত্তরে রাস্তার পূর্ব পাশে পুকুর পাড়ে অবস্থান নিই এবং রাজাকার ও পাকসেনাদেরকে লক্ষ করে পাল্টা গোলাগুলি শুরু করি এতে ওখানে তুমুল আকারে রণক্ষেত্র তৈরি হয়, আমরা সুকৌশলে তাদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ করি। পরবর্তীতে আমরা আত্মরক্ষার্থে সেখান থেকে সরে পড়ি। পরের দিন সকালবেলা আমরা জানতে পারলাম এ যুদ্ধে ০১ এক জন পাক সেনা ও ০২ দুই জন রাজাকার মারা গেছে।

বরইচারার যুদ্ধ : অক্টোবর মাসের শেষের দিকে মাগুরা শালিখা সীমান্তে আসবা-বরইচারা নামক স্থানে আব্দুল লতিফ, আব্দুর রাজ্জাক, এ.কে.এম.ইদ্রিস আলী, মো. আবু বক্কার সিদ্দিক, মফিজ মোল্লা, ইমাম হোসেন, আনোয়ারুল ইসলাম ওরফে নফশের, আবু জাফর সহ আমার গ্রুপের ২০/২৫ জন সহযোদ্ধাকে সাথে নিয়ে ০৩ নং গ্রুপ কমান্ডার, বি.এম.তকব্বর যুদ্ধকালীন (এফ.এফ) কমান্ডার জে,বি,নং- ৪৮৩৬৯ মাগুরা সদর থানা মুক্তিবাহিনীর সাথে যৌথভাবে রাজাকার

ক্যাম্প আক্রমণ করি। ঐ যুদ্ধে ০৩ জন রাজাকার মারা যায়। আর বাকি রাজাকাররা পালিয়ে যায়।

শ্রীপুর বাহিনীর সাথে আমার বাহিনী নিয়ে বরিশাটের (ইটখোলায়) যুদ্ধ : ৭ ই নভেম্বর শ্রীপুর বাহিনীর সাথে বরিশাটের গাংনালিয়া ও ইটের ভাটায় রাজাকারদের সাথে যুদ্ধ করি। এবং দীর্ঘ সময় শ্রীপুর বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত থেকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় যুদ্ধ করি।

শ্রীপুরের নাকোল বাজারের যুদ্ধ : ২৪ নভেম্বর আমি আমার সহযোদ্ধাদের নিয়ে আকবর হোসেন মিয়া ও মোল্লা নবুয়ত আলীর নেতৃত্বে নাকোল বাজারে অবস্থান করি। পাকিস্তানি সেনারা ক্যানালের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা আক্রমণ করি এতে পাক সেনাদের গাড়ি ক্যানালের নিচে পড়ে যায়। একজন কর্ণেল সহ (০৭) সাত জন সেনা নিহত হয়।

পুনরায় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প কুটি বাড়ি ফিরে আসা ঃ এরপর ২৫ নভেম্বর শ্রীপুর বাহিনী থেকে আমি আমার পূর্বের ক্যাম্প ধনেশ্বরগাতী কুটিবাড়ী চলে আসি।

কুচিয়ামোড়া বাজার আক্রমণ ঃ ৪ ডিসেম্বর কুচিয়ামোড়া বাজার আক্রমণ করে রাজাকারদের হটিয়ে দিই।

সহযোদ্ধাদের সাথে বেরইল গ্রামে অবস্থান ঃ ৬ ডিসেম্বর সহযোদ্ধাদের নিয়ে বেরইল গ্রামে অবস্থান করি। মিত্র বাহিনী মাগুরাতে বিমান হামলা চালায়, আনসার ক্যাম্পের পাশে পেট্রোল,ডিপো, পি.টি.আই এবং ভায়নাতে বোমা বর্ষণ করে। পেট্রোল ডিপোতে আগুন দেয়। ইতোমধ্যেই পাকিস্তানি সেনারা বেলনগর হয়ে কামারখালী চলে যায়। যাওয়ার পথে ক্যানেলের ব্রিজটি উড়িয়ে দেয়। মর্টারসেল মারতে মারতে পিছু হটতে থাকে। মিত্র বাহিনীর একটি ক্যাম্প বিধ্বস্ত হয়। ট্রাকে অবস্থানরত ০৭ জনের মধ্যে ০২ জন শহিদ হয় এবং ০৫ জন গুরুতর আহত হয়।

মাগুরা শহর শত্রু মুক্ত : ৭ ডিসেম্বর মাগুরা মুক্ত হয়, আমরা বিজয় উল্লাস করতে থাকি। নৌকা পাল তুলে দেরে পাল তুলে দে ....গানটি গাইতে গাইতে মাগুরাতে প্রবেশ করি, চারদিকে বিজয় উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে।

বিজয় উল্লাস : ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস। বিশ্বের সেরা যোদ্ধা পাকিস্তানি বাহিনী মিত্র বাহিনী, মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ৩০ লক্ষ শহিদ এবং

০২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে ০৯ মাসের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পাই লাল সবুজের পতাকা, পাই স্বাধীনতা। এরপর আমি আমার গ্রুপের কোন সহযোদ্ধাদের বাড়িতে যেতে না দিয়ে মরহুম জননেতা আসাদুজ্জামান এম.পি. এর অনুমতিক্রমে কাটাখালী মিলঘরে ক্যাম্প করি। পরবর্তীতে অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ হলে মাগুরা নোমানী ময়দানে মিলিশিয়া ক্যাম্পে অস্ত্র জমা দিই।

২০০৩ সাল থেকে অদ্যাবদি পর্যন্ত :

মাগুরার মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক সহযোগিতা : ২০০৩ সাল থেকে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ মাগুরা সদর উপজেলা কমান্ডের কোন সময় আহবায়ক এবং উপজেলা কমান্ডার হিসেবে বারবার নির্বাচিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক সহযোগিতা করে আসছি।

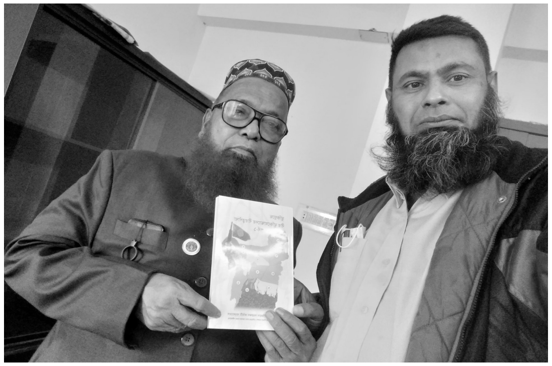

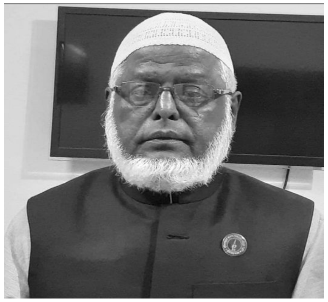

বীর মুক্তিযোদ্ধা
মোঃ মাইনুল হোসেন
মুরাদনগর, কুমিল্লা

১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনের আমি একজন সক্রিয় কর্মী ছিলাম, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের আমি একজন সক্রিয় কর্মী ছিলাম, এ সময় আমি আমার ইউনিয়নে ছাত্রলীগ গঠন করি এবং সেটার জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম আমি। সত্তরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী সক্রিয় কর্মী ছিলাম, ১৯৭১ সালের ৭ ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৮ মিনিটের ভাষণ আমি উদ্বুদ্ধ হয়ে পর্যায়ক্রমে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য ভারতে যাই। ভারতে যাওয়ার পরে আমি ভারতের বাগমারা ক্যান্টনমেন্ট ক্যাম্পে এক মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণ শেষে অস্ত্রের জন্য মেলাঘর ক্যাম্পে আমরা অপেক্ষা করছিলাম, সম্ভবত সাতদিন পরে আমরা অস্ত্র পেয়ে গেলাম, অস্ত্র দেয়ার পর আমাদেরকে বর্ডারে সম্মুখ যুদ্ধের ট্রেনিং হিসেবে আমাদেরকে ব্যাংকারে ভেতরে প্রশিক্ষণ দিল আরো ১৫ দিনের। আমরা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এর পাশ দিয়ে কুমিল্লায় প্রবেশ করি। আমরা ছিলাম গেরিলা আমাদের বেসিক ট্রেনিং ছিল হিট অ্যান্ড রান, আঘাত করো এবং তোমরা চালিয়ে যাও। নিজে বাঁচতে হবে আবার আঘাত করতে হবে নিজে না বাঁচলে আঘাত করা যাবে না। আমরা এই ফরমুলা নিয়েই চলতে ছিলাম যেহেতু আমাদের অস্ত্র পর্যাপ্ত ছিল না। আমাদের কাছে অস্ত্রের মধ্য ছিল থার্টিসিক্স হ্যান্ড গ্রেনেড, থ্রী নট থ্রী রাইফেল, স্টেনগান, এসএলআর, এলএমজি, টুইঞ্চ মর্টার, ইভেন ব্রিজ উড়ানোর জন্য যে ডিনামাইট সেই এক্সপ্লোসিভ এর ট্রেনিং ও আমাদের হয়েছে এবং তা আমাদের কাছে ছিল। আমার অস্ত্র ছিল এসএলআর। আমরা ছোট ছোট যুদ্ধ করতে করতে অক্টোবরের ২৮ ও ২৯ তারিখে দুই দিন দুই রাত আমরা মুরাদনগর ও দেবিদ্বার থানার

গোমতী নদীর উপরে একটা ব্রীজ ছিল আমরা মুক্তিযোদ্ধারা সেটাকে ভেঙে ফেলেছি। যেহেতু ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট অনেক সুন্দর ছিল পাকিস্তানিদের তাই আমরা এই ব্রিজটা ভেঙে তাদের গতিরোধ করার চেষ্টা করেছি। এজন্য আমরা দুই দিন দুই রাত ধরে যুদ্ধ করেছি, রাস্তার দুই পাশে পলাতক অবস্থায় থেকে আমরা যুদ্ধ করেছি। এই যুদ্ধে কতজন পাকিস্তানি আর্মি মারা গেছে তা আমি বলতে পারব না, কিন্তু আমার পাশের দুই জন মুক্তিযোদ্ধা মারা গিয়েছিল। একজন আমার বন্ধু আবুল বাশার আর একজন ছিল রমিজ উদ্দিন সে আর্মিতে ছিল। আমার বন্ধুকে সরানোর জন্য আমি কাধে নিয়ে উঠেছি তখন আমার পাশে থেকে একজন বলল আরে তোর পায়ে গুলি লেগেছে। তখন আমি লাশটাকে নিচে রেখে আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আমার পা থেকে অনবরত রক্ত পড়ছে। গুলিটা প্রায় ঢুকে গেছে সামান্য একটু বাহিরে ছিল, আমার পাশের একজন মুক্তিযোদ্ধা আমার পা থেকে গুলিটা বের করতে সহযোগিতা করলো, গুলি বের করার পরে সে আমাকে জিজ্ঞেস করল তোমার কাছে রুমাল আছে কিনা, আমি বললাম আছে, তখন সে পাশ থেকে দুবলা ঘাস চিবিয়ে যাবি আমার ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দিল এবং রুমাল দিয়ে বেঁধে দিল। বাধার পরে সেখান থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে গ্রামের এক পল্লী চিকিৎসকের কাছে যাই তার নাম ছিল রবীন্দ্রনাথ, গিয়ে তাকে বললাম দাদা এই অবস্থা আমি তো গুলি খাইছি এই জায়গাটা দেখুন, তিনি বললেন আমাদের কাছে তেমন কোন ওষুধ নাই, আমি বললাম দাদা আপনার কাছে যা আছে তাই দিয়ে দেন, তিনি ক্ষত স্থান দেখে বললেন এটা কি দিয়েছেন। আমি বললাম দুবলাঘাস চিবিয়ে এখানে লাগিয়ে দিয়েছে। তিনি বললেন এতেই সেরে যাবে। আমি বললাম না দাদা কিছু ওষুধ দেন তখন তিনি আমাকে কয়েক প্রকার ওষুধ দিলেন। ওষুধগুলো খাওয়ার পরে আস্তে আস্তে আমার ক্ষতটা শুকিয়ে আসছে, তখন আমি আবার যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেলাম। এভাবে আমরা যুদ্ধের মাঝে দিন পার করতে থাকলাম, ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো। পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের পর সেই উল্লাসে আমরা নিজেরা তাতে বিদ্যমান থাকলাম। বঙ্গবন্ধু দেশে আসলেন আমরা অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলাম।

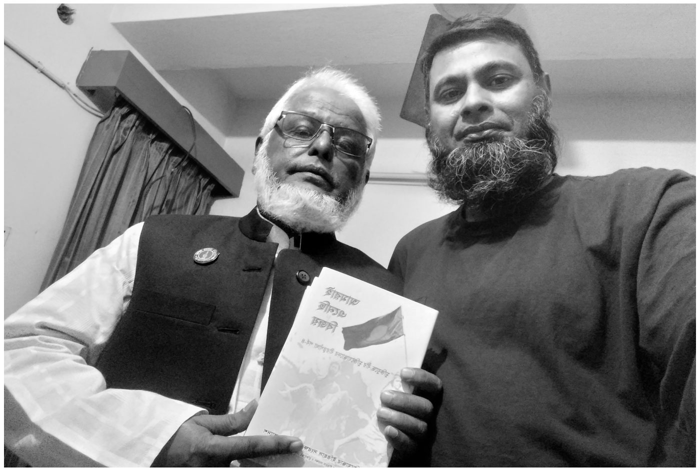

বীর মুক্তিযোদ্ধা
সুশীল বিকাশ নাথ,
ডেপুটি কমান্ডার ১৫৫নেংগ্রুপ, ১নং সেক্টর কক্সবাজার।

“১৯৭১ সালের যুদ্ধ জয়ের স্মৃতিগাথা”

১৯৭১ সাল। তখন আমি চট্টগ্রাম জেলাধীন সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত সাতকানিয়া সরকারি কলেজের স্নাতক (বি.এস-সি) শ্রেণির ফাইনাল পরীক্ষার্থী। তখন দেশকে স্বাধীন করার জন্য ও বাংলাদেশের বাংলা ভাষাভাষি জনসাধারণের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সারাদেশে উত্তাল গণআন্দোলন চলছে। এরই মধ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশকে স্বাধীন করার বিভিন্ন রূপরেখা উল্লেখ করে ৭ই মার্চ-১৯৭১ সালে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসমাবেশে বক্তব্য রাখেন। সে বক্তব্যে আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার দিক নির্দেশনা পাই। ২৫ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ কালরাত্রিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর হত্যার উদ্দেশ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অগণিত বাঙালিদের হত্যা করতে শুরু করল। সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন কলেজের পাঠ বাদ দিয়ে আমরা গ্রামের বাড়িতে এসে পড়ি। গ্রামের বাড়িতে এসে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা মোতাবেক আমাদের ইপিআর সৈন্যদের জন্য গ্রামের হাট বাজার থেকে রসদ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত হই। ইপিআর বাহিনীর সাথে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা বাহিনীর সাথে ক্ষণে ক্ষণে খণ্ড যুদ্ধ চলে। পরে ইপিআর সৈন্যরা পাক্-বাহিনীর কাছে লড়াইয়ে টিকতে না পেরে পিছু হটতে বাধ্য হন। এদিকে পাকবাহিনী ও বিহারীরা বাঙালিদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে শুরু করে। তখন আমি ও আমার কাকাতো জ্যাঠাতো ভাই মিলে মোট ৫ জন ভারতে গিয়ে যুদ্ধের ট্রেনিং গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার মনস্থির করি। প্রথম দিকে আমাদের পিতা

মাতা বাধা দিলেও পরবর্তীতে রাজি হন। এদিকে পাকবাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমরা দেশত্যাগে বাধ্য হই। উপায়ন্ত না দেখে সাধারণ জনগণের সাথে আমরা চূড়ান্তভাবে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। ভারতে আশ্রয় নিতে প্রথমে বান্দরবান রুমা বাজার এবং থানছি বলিবাজার হয়ে ভারত বার্মা সীমান্তের ভারতীয় ফারুয়া ক্যাম্পে পৌঁছাই। সেখানে ভারতীয় সৈন্যরা আমাদেরকে রেশন পত্র দিয়ে পরবর্তী ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। ভারতীয় ফারুয়া ক্যাম্পে একরাত্র অবস্থান করার পর ভারতীয় সৈন্যেরা স্কটের মাধ্যমে বাছিতলাং ক্যাম্প, পানছড়ি ক্যাম্প, কছুছড়ি ক্যাম্প, দমদম ক্যাম্প, হয়ে ভারতের মিজোরাম রাজ্যের দেমাগ্রীতে এসে পৌঁছলাম। এসে প্রথমে দেমাগ্রী রিফিউজি ক্যাম্পে আমাদের আশ্রয় হলো। আমরা রিফিউজি ক্যাম্পে থাকা অবস্থায় আমার মতো ২২-২৩ বছরের যুবকদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশমুক্তির প্রত্যয় নিয়ে ভারতীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত সৈন্যরা বিভিন্ন ক্যাম্পে ক্ষুদে মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে অভিযান পরিচালনা করে। তাঁদের বাছাইয়ে সৌভাগ্যক্রমে আমার নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা আমাদের প্রথমতঃ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ও দেশের মানুষের উপর জুলুম অত্যাচার করার কাহিনি বর্ণনা করে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে অনুপ্রাণিত করলেন। অনেকেই রাজি হয়ে যান এবং যুদ্ধে যাওয়ার সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তন্মধ্যে আমিও রাজী হই। আমি মে ১৯৭১ সালের প্রথম সপ্তাহে দেমাগ্রীর মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যোগদান করি। তখনকার দোহাজারী হাসপাতালের ডা. জনাব এম.কে বড়ুয়া আমাদের শারীরিক পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে আমাদের প্রশিক্ষণ শুরু হলো। প্রথমে কয়েকজন বাঙালি প্রশিক্ষক আমাদেরকে ট্রেনিং দিতে শুরু করেন। পরবর্তীতে ভারতীয় সৈন্যরা দেখেন যে, বাঙালিদের প্রশিক্ষণ ঠিক হচ্ছে না। তখন ভারতীয় ওস্তাদরাই আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। ভারতীয় ওস্তাদদের মধ্যে কয়েকজনের নাম চির স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন, সর্বজনাব ওস্তাদ, শিমুল ওস্তাদ, হাবিলদার রাজু, বীর পাল, ধর্ম পাল, মেজর ভগবৎ, মেজর তারা প্রমুখ। আমাদেরকে প্রথমে ০৩

(তিন) মাসের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণের মধ্যে ৩০৩ রাইফেল, মার্ক-৪ রাইফেল উল্লেখযোগ্য ছিল। এছাড়া আমরা যারা বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম, তাদেরকে বিশেষভাবে মাইন, এক্সপ্লোসিভ ও প্রোপাগান্ডা বিষয়ে সম্যক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। রাত্রের বেলায় আমাদেরকে পিঠে ভারী অস্ত্র নিয়ে কিভাবে পাহাড়ের উপর ক্লোরিং করে যুদ্ধ করতে হয়, তাও শিখিয়েছেন। প্রশিক্ষণকালে যারা আমাদের সাথে সহযোদ্ধা' ছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলাম।

১. জনাব মাহবুবুর রহমান (চকরিয়া)

২. জনাব জাফর আলী হিরু (চন্দনাইশ)

৩. জনাব নজরুল ইসলাম চৌধুরী এমপি. (চন্দনাইশ)

৪. বাবু অর্জুন দাশ (চকরিয়া)

৫. বাবু সন্তোষ দাশ (চকরিয়া)

৬. জনাব গোলাম রব্বান (চকরিয়া)

৭. জনাব ছিদ্দিক আহমদ (পেকুয়া)

যুদ্ধকালীন সময়ে দেমাগ্রী প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের আলফা কোম্পানির অধীনে আমি প্লাটুন কমান্ডার ছিলাম এবং এফ এফ নাম্বার ছিল ৮৬। দেমাগ্রী প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের সংকুলান না হওয়াতে আমাদের ২০০ জনের মত মুক্তিযোদ্ধাকে দেমাগ্রী থেকে তৈছং ক্যাম্প, লুংছং ক্যাম্প, রুইতালং ক্যাম্প, টানাব্রীজ ক্যাম্প, পাইছাং ক্যাম্প হয়ে লুংলাই ক্যাম্পে কিছু দিনের জন্য রাখেন। সেখানে এক পুলিশের লোক (যাদেরকে এম.এফ বলা হতো) এক মিজো মহিলার সাথে অপ্রীতিকর ঘটনা আমাদের সবাইকে শাস্তিমূলক বদলী হিসেবে কুড়িগ্রাম মানকাচর ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য ক্যাম্প ইনচার্জ কর্নেল নন্দলাল সিং সিদ্ধান্ত নেন। দোষী লোকটাকে কোয়ার্টার গার্ড দিয়ে আমাদেরকে প্রথমে মিজোরাম রাজ্যের রাজধানী আইজলে পাঠান। সেখান থেকে ১ সপ্তাহ পর শীলচরে পাঠান। শীলচর থেকে গোহাটি, পরে সেখান থেকে ৭টি আর্মি লরি দিয়ে কুড়িগ্রাম মানকাচর ১১ নম্বর সেক্টরে পাঠান । সেখানে ক্যাম্প ইন্চার্জ

ছিলেন কর্ণেল জনাব আবু তাহের। উনি আমাদেরকে অপারেশনে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য বলেন। যে জায়গায় আমাদেরকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন, সে জায়গাটি আমাদের কাছে অপরিচিত হওয়াতে আমরা অপারেশনে যেতে অপারগতা প্রকাশ করি। পরবর্তীতে সপ্তাহ খানেক ওখানে থাকার পর কর্নেল এম এ জি ওসমানী সাহেবকে দিল্লি থেকে হেলিকপ্টারযোগে ১১ নম্বর সেক্টরে আনা হয় এবং উনি আমাদের সবাইকে ফলোইন করাইয়া আমাদের অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চান। আমরা উনাকে অপরিচিত জায়গায় গেরিলা যুদ্ধ করা জীবন ঝুঁকি আছে বলাতে উনি বিষয়টি আন্তরিকতার সাথে অনুধাবন করেন এবং আমরা ৮০% ছাত্র হওয়াতে আমাদের দাবি তিনি সহজেই মেনে নিয়েছেন। তখন তিনি সুকৌশলে আমরা যারা চট্টগ্রামের তাদেরকে ত্রিপুরা ১ নম্বর সেক্টরে হরিনা ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং বাকি যারা নোয়াখালীর লোক ছিল তাদেরকে ২নম্বর সেক্টরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমরা ১ সপ্তাহ পর্যন্ত ১নম্বর সেক্টরে থাকার পর যার যার এলাকায় অপারেশনে যাওয়ার জন্য সেক্টর কমান্ডার নির্দেশ দিয়েছেন। ১ নম্বর সেক্টরে থাকাকালীন সময়ে আমাদেরকে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে দেয়া হয়। যেমন আমাদের চকরিয়া গ্রুফ ১৫৫ নম্বর, পটিয়া গ্রুফ ১৫৪ নম্বর এবং সাতকানিয়া গ্রুফ ১৫৩ নম্বর। নভেম্বর ৭১ এর প্রথম সপ্তাহে আমরা উপরোক্ত ৩ গ্রুফ অপারেশনে যাওয়ার জন্য রাত ৮টায় খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমাদেরকে অস্ত্র বিতরণ ও খরচের টাকা পয়সা দিয়ে শপথ গ্রহণের প্রস্তাব নিতে বলেন। তৎকালীন এম.এন এ ডা. প্রয়াত বিএম ফয়েজুর রহমান (সাতকানিয়া) ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক প্রয়াত বাবু স্বপন চৌধুরী আমাদেরকে শপথ বাক্য পাঠ করিয়ে রেকিম্যান এর মাধ্যমে রামগড় বর্ডার পার করিয়ে দেন। ফটিকছড়ির যোগ্যচলা নামক একটা স্থানে আমাদের সাথে রাজাকার ও অল্প সংখ্যক পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে গুলি বিনিময় হয়। সে যুদ্ধে আমরা নতুন হলেও তাদেরকে পিছু হটাতে সক্ষম হই এবং আমরা প্রথমবারের মতো জয়ী হই। এতে আমাদের মনোবল অসম্ভব রকমের বেড়ে গেলো। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল নিজ এলাকায় চলে আসা। ৪/৫ দিন হাটার পর আমরা রাউজান থানার অন্তর্গত বেতাগী নামক

স্থানে হালদা নদী পাড়ে আসলাম। এর পর আমরা গ্রুপভিত্তিক আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন স্থানে দেশীয় আলবদর, আলশামস ও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। এতে আমরা বহু সহযোদ্ধাকে হারাই। বহু পঙ্গুত্ব বরণ করেন। বর্তমানে অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। পরম করুণাময়ের আশির্বাদে আমি এখনো মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে কোনোরকমে বেঁচে আছি।

আমি যুদ্ধকালীন সময়ে মাত্র ৪/৫ টি দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করলাম। যেখান থেকে দেশবাসীর দোয়ায় ও মহান স্রষ্টার আশির্বাদে এখনো বেঁচে থেকে কলম ধরতে পারছিঃ

দুর্ঘটনা নম্বর ০১:

১৯৭১ সালের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের দিকে আমরা ১নং সেক্টরের ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫ নং তিনটি গ্রুপ একসাথে শপথ বাক্য পাঠ করে ত্রিপুরা হরিনা ক্যাম্প থেকে রামগড় হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। ফটিকছড়িতে রাজাকার ও পাক বাহিনীর সাথে খণ্ড খণ্ড কয়েকটা যুদ্ধ করতে করতে নিজ নিজ এলাকায় যাওয়ার জন্য অগ্রসর হতে থাকি।

আমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসার পথে পথিমধ্যে রাউজান/রাঙ্গুনীয়া থানার বেতাগী গ্রামে হালদা নদী পার হওয়ার সময় রাজাকারের সাথে গুলি বিনিময় হয়। আমরা ৪/৫ টা নৌকা ভাড়া করেছিলাম। আমাদের নৌকাগুলো নদীর মাঝখানে পৌঁছালে রাজাকারের গুলিবর্ষণের মুখে রুখতে না পেরে ধাক্কাধাক্কি করে নৌকা থেকে নামার সময় নৌকাটি পানিতে ডুবে যায়। তখনো রাজাকাররা গুলিবর্ষণ অব্যাহত থাকে। তখন মনে মনে ভাবছিলাম হয়তো আমাদের সবার সলিল সমাধি সেখানেই হবে। আমি কোনো রকমে কচুরিপানার সাথে মাথা লুকিয়ে পানিতে গা ভাসিয়ে দিয়ে এক হাতে অস্ত্র ও অন্য হাতে সাঁতার কেটে জীবন রক্ষা করি। কুলে উঠার পর আমরা যখন বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন এলাকা থেকে গুলি বর্ষণ শুরু করি তখন রাজাকাররা প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, সে সময় আমার কয়েকজন সহযোদ্ধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, চট্টগ্রাম-১৪, চন্দনাইশ-

সাতকানিয়া আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম চৌধুরী, চন্দনাইশ থানা কমান্ডার জনাব জাফর আলী হিরু, তৎকালীন পটিয়া থানা কমান্ডার আবু তাহের খাঁন খসরু, চকরিয়া থানা কমান্ডার মাহাবুবর রহমান।

দুর্ঘটনা নম্বর ০২:

আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা সেদিন সবাই অক্ষত থেকে বেতাগী বোয়ালখালী হয়ে আসার পথে করলডেঙ্গা পাহাড়ের কাছে জৈষ্টপুরা নামক গ্রামে একটা সেন বাড়ির দ্বিতল মাটির ঘরে মুক্তিযোদ্ধাদের রাখা বিশ্রামাগ্রারে গ্রুপের এল.এম.জি. ম্যান মি. অর্জুন দাশ (ফোন নম্বরঃ ০১৮২১-৯৭৫৬০৬) ও আমি সামনা সামনি বসে অস্ত্রের ফুলথ্রু করার সময় অর্জুন দাশের এল.এম.জি. এর চেম্বারে থাকা একটি বুলেট অসাবধানতাবশতঃ আমার ডানকান ঘেষে ফায়ার হয়। সৌভাগ্যক্রমে আমি বেঁচে গেলেও অনেকদিন যাবত আমার ডানকান বধির অবস্থায় ছিল। মাত্র ১ ইঞ্চি পরিমাণ ব্যবধান থাকায় দেশবাসী ও ঈশ্বরের কৃপায় সেদিনকার মতো বেঁচে যাই। সেই থেকে এখনো পর্যন্ত আমার ডানকানে মাঝে মাঝে যন্ত্রনা অনুভব করি।

দুর্ঘটনা নম্বর ০৩:

উল্লেখিত আমরা তিন গ্রুপ বোয়ালখালীর পাহাড়ী পথে হাঁটতে হাঁটতে বর্তমান চন্দনাইশ উপজেলার দোহাজারী পাহাড়ী এলাকায় পৌঁছলে আমরা দোহাজারীর জামীজুরীতে আলী হোসেন মাস্টারের খামার বাড়ির সন্ধান পাই। তখন আমরা সবাই ওনার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করি। ইতোমধ্যে দোহাজারীতে অবস্থানরত পাক্ বাহিনীর ইনফরমার চেঙ্গীস ফকির এর মাধ্যমে আলী হোসেন মাস্টারের খামার বাড়িতে আমাদের অবস্থানের কথা জেনে যায়। সাথে সাথে তারা আমাদেরকে আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তখন আমাদের রেকিম্যান বাবু সুমন বড়ুয়ার মাধ্যমে জানতে পারি যে, তারা আমাদেরকে দিনের বেলায় আক্রমণ করবে। এ খবর অবগত হয়ে আমরা তখন আর্মির নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে এমবুশে চলে যাই। সারাদিন এমবুশে থাকার পরও তারা আসেনি। সন্ধ্যার পর আমরা এমবুশ উইথড্র করি এবং রাতের জল খাবার

তৈরি করার জন্য কুতুবদিয়া নিবাসী মুক্তিযোদ্ধা পুলিন শীলকে দায়িত্ব অর্পণ করি। কিন্তু আমরা স্ব স্ব গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধারা নিজস্ব সিকিউরিটি ডিউটি ভাগ করছিলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে যখন অন্ধকার নেমে আসলো তখন পাক হানাদার বাহিনী আমাদেরকে দূর থেকে মটার শেলের মাধ্যমে আক্রমণ শুরু করে। সাথে সাথে আমরাও পাল্টাপাল্টি আক্রমণ শুরু করি। সে সময় আমাদের কাছেও ভারী অস্ত্র শস্ত্র ছিল। যেমন ৩০৩ রাইফেল, GF রাইফেল LMG, SLR, SMG, 36mm CMG. 2 inch মর্টার, মাইন ও এক্সপ্লোসিভ। এই যুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী ও রাজাকার মিলে ১০/১২ জন নিহত হন। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদেরও দুইজন সদস্য স্পটেই মারা যান। তারা হলেন বিমল চৌধুরী ও সুভাষ মজুমদার। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধকালীন সময়ে নিহত ঐ দুই সহযোদ্ধার ঠিক মাঝখানে আমি ছিলাম। দুই জন মুক্তিযোদ্ধার হাতে LMG, SLR এর মতো ভারী অস্ত্র থাকার পরও বুলেট শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে ম্যাগজিনে গুলি লোড করার সময় শত্রুপক্ষের গুলিতে তাদের মৃত্যু হয়। কিন্তু অলৌকিক ভাবে আমি বেঁচে যাই। আমার হাতে ছিল 36mm CMG.

দুর্ঘটনা নম্বর ০৪ :

পরে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে আরো গভীর জঙ্গলে চলে গেলাম। দুইদিন পরে আমরা তিন গ্রুপের সহযোদ্ধারা একত্রিত হলাম। পরে আমরা জানতে পারলাম শঙ্খনদীর দক্ষিণ পাড়ে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সৈন্য বান্দরবান থেকে হেলিকপ্টার যোগে দোহাজারীতে এসেছে। আমরাও তাদের সাথে মিলিত হয়ে দোহাজারী পাক বাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণ করে দখল করি হানাদার বাহিনীর লোকেরা পটিয়ার দিকে চলে গিয়েছিল। মিত্র বাহিনীর কমান্ডার মেজর গুরং সিং আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, দোহাজারী ব্রিজের নীচে বাংকারে কতজন লোক নিহত হয়েছে তা দেখে আসার জন্য। আমি আমার দুইজন সহযোদ্ধা যথাক্রমে অর্জুন দাশ ও সন্তোষ দাশ কে নিয়ে ব্রীজের নীচে নামার সময় হঠাৎ কাটাতারের জালের সাথে শ্লীপ খেয়ে আমি নীচে পড়ে যাই। তখন আমার হাতে ও পায়ে মারাত্মক জখম হয়ে শরীরের অধিকাংশ স্থানে চামড়া উঠে গিয়ে অজস্র রক্ত ঝরতে থাকে। আমার এই অবস্থা দেখে মিত্র বাহিনীর একজন সৈন্য আমাকে

কোলে নিয়ে দোহাজারী স্কুলের পিছনে হাজারী দীঘির পাড়ে একটি বটগাছের নীচে রেখে এমন একটি তৈল মালিশ করে দিলেন, যার ফলে আমি দুদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাই। এখানে উল্লেখ্য যে, সেদিন আকাশ ভারী কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল।

দুর্ঘটনা নম্বর ০৫:

আমরা ৭১ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চকরিয়া সিএন্ডবি অফিসে ক্যাম্প করি। আমাদের কাজ ছিল সারাদিন রাজাকারদের নিকট থেকে অস্ত্রশস্ত্র জমা নেয়া। খুব সম্ভবতঃ ডিসেম্বরের ১৪/১৫ তারিখের দিকে কক্সবাজার থেকে মিত্র বাহিনীর অনেক সৈন্য চকরিয়া স্কুল মাঠে জড়ো হয়। তখন খুশিতে সাধারণ লোকেরা তাদের দেখতে গায়ের উপর উঠে যাওয়ার উপক্রম হলে তারা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন। কারণ তারা বাংলা জানতেন না। আবার বাঙালিরাও হিন্দি জানতেন না। তখন ভাষাগত সমস্যা থাকার কারণে তারা হিন্দি জানা ভারতীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিবাহিনীর সদস্য খুঁজতে থাকেন। সেসময় আমি ৩/৪ জন মুক্তিযোদ্ধাকে সাধারণ লোকদের সরানোর জন্য প্রেরণ করি। এর মধ্যে চকরিয়ায় আমরা আছি জেনে আমার এক আপন জ্যেষ্ঠ কাকাতো ভাই মহেশ চন্দ্র দেবনাথ বারবাকিয়া থেকে আমাদের দেখতে চকরিয়াস্থ স্কুল মাঠে আসেন। ওখানে আমার আরেক জ্যেষ্ঠ কাকাতো ভাই মুক্তিযোদ্ধা ধনঞ্জয় দেবনাথ ভারতীয় মিত্রবাহিনীর নিরাপত্তার সশস্ত্র দায়িত্বে ছিলেন। গ্রাম থেকে আসা আমার বড় ভাই মহেশ চন্দ্র দেবনাথ, (তাঁরই আপন ছোটভাই) স্কুল মাঠে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর পাহারারত মুক্তিযোদ্ধা ধনঞ্জয় দেবনাথকে দেখতে পেয়ে আবেগের বশবর্তী হয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। অতঃপর কুশল বিনিময়ের ফাঁকে তাঁর কাছে থাকা ভারী অস্ত্রটি কিভাবে চালায় তা জানতে চায়। এরইমধ্যে কথার ফাঁকে ফাঁকে তিনি (আমার বড় ভাই) তাঁর অস্ত্রের গায়ে হাত বুলাতে থাকেন। এক পর্যায়ে অটো ট্রিগারে চাপ পড়ার সাথে সাথে ৩/৪টি বুলেট তাঁর বুকে বিদ্ধ হয়ে সাথে সাথেই তাঁর মৃত্যু হয়। অস্ত্রের শব্দ শুনে আমরা যে অবস্থায় আছি সে অবস্থা থেকে ঘটনাস্থলে ছুটে আসি এবং ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করি। তখন ভারতীয় মিত্র বাহিনীর লোকেরা এসে তদন্ত করে

ঘটনাটি নিছক দুর্ঘটনা বলে সাব্যস্থ করেন এবং এ ঘটনাটি হাজার হাজার লোকের সামনে হওয়ায় তাঁকে শহিদ মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেন, যা আর পরবর্তীতে করা হয়নি। আমার বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর ভঙ্গুর মন নিয়ে পরবর্তী আমরা আরো কয়েকদিন ক্যাম্পে থাকার পর ভারতীয় মিত্র বাহিনীর মেজর গুরবাছান সিং ও তাঁর দল আমাদের কাছ থেকে রক্ষিত অস্ত্র ও গোলাবারুদ সব নিয়ে আমাদেরকে যার যার গ্রামের বাড়িতে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

আমি নিজ হাতে যুদ্ধে অগণিত সংখ্যক রাজাকার ও পাক বাহিনীর সদস্যকে গুলি করে হত্যার পরও আমার মন এতটুকু বিচলিত হয়নি। কিন্তু যুদ্ধ করতে করতে নিজে বেঁচে গেলেও হঠাৎ ভাইয়ের মৃত্যুতে আমি খুব ভেঙে পড়ি। আমার সেই ভাইয়ের একটি ছেলে ছিল যার বয়স ছিল তখন ১মাস। সে বর্তমানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত বাগমনিরাম আবদুর রশীদ সিটি কর্পোরেশন বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তাঁর নাম সুকুমার দেবনাথ। প্রধান শিক্ষক সুকুমার দেবনাথ আক্ষেপ করে বলেন যে, তাঁর বাবা যুদ্ধের মাঠে শহিদ হওয়ার পর শহিদের তালিকায় তার বাবার নামটি লিখিত থাকার পরও অদৃশ্য কারণে সেটা পরবর্তীতে বাদ দেয়া হয়েছে। গত ২০১৭ সালে যখন নতুন মুক্তিযোদ্ধার তালিকা তৈরির কাজ সরকার হাতে নিয়েছে। তখন আমাদের প্রত্যয়ন পত্র নিয়ে সেও আবেদন করেন যার এখনো পর্যন্ত কোনো খবর নাই। এ ঘটনা টি এলাকার মুরুব্বিদের মুখে এখনো শোনা যায়।